প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

প্রকাশক : ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক : ফণিভূষণ হাজরা
গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনেটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : বিভূতি সেনগুপ্ত

আলবার্তো মোরাভিয়া রচিত Conjugal Love-এর বাংলা
অনুবাদ ইটালির মেসার্স কাসা এডিট্রিস ভ্যালেন্টিনো
বম্পিয়ানি অ্যাণ্ড কোং-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত।

এক

আমার স্ত্রীর কথাই আগে বলব। অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে ভালবাসার পার্থক্য হল এই যে, ভালবাসার পাত্রকে খুঁটিয়ে দেখার ভেতর একটা গভীর আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায়। এই যে আনন্দের অনুভূতি, এ কিন্তু শুধু মাত্র প্রশংসার যোগ্য সৌন্দর্য উপভোগেই গড়ে ওঠে না; কমবেশি সবকটি ত্রুটিবিচ্যুতিকেও আশ্রয় করে এই উপভোগের পূর্ণতা ঘটে। বিবাহের প্রথম দিনটি থেকেই লীডাকে তাকিয়ে দেখতে আর তার মুখের ও দেহের প্রতিটি তুচ্ছ পরিবর্তনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে আমি বিশেষ এক ধরনের আনন্দ পেয়ে এসেছি। তিনটি সন্তানের জননী হয়ে আজকে তার বহু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু সেদিন তার বয়স ছিল তিরিশের কিছু ওপরে। দোহারা চেহারার লীডাকে রূপসীই বলব, কারণ তার মুখ আর দেহের গড়ন সত্যিই সুন্দর। কিন্তু তাই বলে তার রূপকে একেবারে নিখুঁত বলে ধরে নেওয়া যায় না। প্রাচীন ছবির মধ্যে একধরনের অস্পষ্ট সৌন্দর্য থাকে। অনেক মাঝারি ধরনের ছবির ভেতরেও আমরা বিশেষ সৌন্দর্যের সন্ধান পাই, শুধুমাত্র তার সুপ্রাচীনতার জন্য। ওর পাতলা গড়নের নিশ্চেষ্ট অথচ আকর্ষণীয় মুখখানি ঐসব প্রাচীন ছবির মধ্যে যে পৌরাণিক দেবমূর্তি দেখা যায় তাদের মুখের সঙ্গেই সাদৃশ্যযুক্ত বলে মনে হয়েছিল আমার। চোখের মধ্যে ওর এমন এক রহস্যময় ছবির আভাস থাকত যাকে স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায় মাত্র। এ যেন পাঁচিলের ওপর হঠাৎ এসে-পড়া অস্তগামী সূর্যের একটু রশ্মিরেখা; হয়তো বা উত্তাল সমুদ্রের ওপর আকাশে ভেসে-চলা মেঘখণ্ডের একটুকরো ছায়া। ওর বড় বড় নীলচোখের

উজ্জ্বল মণিগুলিই শুধু ওকে বৈশিষ্ট্য দেয় নি, ওর অযত্ন-কুঞ্চিত
কেশগুচ্ছও ওর রূপকে বাড়িয়ে তোলার কাজে সাহায্য করেছিল
সব মিলিয়ে লীডার অবয়ব ওর এমন একটি মনের সন্ধান দিত
যেখানে ভীতি আর সঙ্কোচ একাকার হয়ে মিশে আছে। ওর টিকলো
নাকটি কিন্তু ওর সুডৌল লাল মুখখানির সঙ্গে বেশ মানানসই ছিল
বড় মুখখানির ভাঁজগুলির সঙ্গে ছোট্ট চিবুকের ওপর নেমে-আসা নীচের
ঠোঁটটির অবশ্য কোন সামঞ্জস্য ছিল না। তবু ওরা এমন এক
রূপলোক গড়ে তুলত যার মধ্যে অশান্ত ভোগবাসনার আভাস বেশ
চোখে পড়ত। ওর ডাগর আর তির্যক চোখের বিস্ফারিত মণিগুলির
মধ্যে বিষণ্ন নির্জনতাপ্রয়াসী যে কামনা ফুটে উঠত, মাথার চুলগুলির
ভাষাতেও যেন ঠিক তারই ধ্বনি শোনা যেত। সামঞ্জস্যহীন, তবু
বড় সুন্দর ওই মুখখানির যে বর্ণনা আমি দিয়েছি তার মধ্যে ছিল
অননুভবনীয় এক রূপের প্রকাশ। ঐ রূপ কেমন যেন বিশেষ বিশেষ
পরিবেশে বিশেষ মুহূর্তগুলিতে ভেঙে চুরে অদৃশ্য হয়ে যেত। অন্তত
আমার তাই মনে হয়েছে। ওর দেহের সম্বন্ধেও সেই একই মন্তব্য
করতে হয়। কটিদেশ থেকে উপর দিকটা অল্পবয়সী মেয়েদের মত
হালকা ছিপছিপে গড়নের। অথচ ওর দেহের অবশিষ্ট নিম্নাঙ্গের
দিকে তাকিয়ে দেখলে বোঝা যেত সেগুলি বেশ শক্তসমর্থ, পেশীবহুল
আর তাদের সঞ্চালনও ছিল যথেষ্ট সামর্থ্যের পরিচায়ক। অঙ্গ-
সংস্থানের এইযে সামঞ্জস্যহীনতা, তা কিন্তু ওর মুখাবয়বের মতই একটি
বিশেষ সুষমার আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। এই বৈশিষ্ট্য ওর
সমস্ত দেহটিকে এমন এক নিখুঁত রূপলাবণ্যের পরিমণ্ডলে ঢেকে
রাখত যাকে মনে হত এক স্পর্শনাতীত দেহকান্তি, অথবা কোন
এক রহস্যময় মহিমান্বিত আলোকমণ্ডল। সত্যি কথা বলতে কি,
ওর রূপের দিকে তাকিয়ে অনেক সময় আমার মনে হয়েছে ও যেন
এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারী যার মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতির চিহ্নমাত্রও
নেই। শান্ত সংগতিপূর্ণ সুসমঞ্জস লাবণ্যের ও যেন এক রূপমূর্তি।

প্রকাশযোগ্য ভাষার অভাবে যাকে আমি বিভ্রান্তিকর অতিমানবীয় সৌন্দর্য বলতে পারি, যা নিঃসন্দেহে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছে। কিন্তু ভ্রান্তির এই স্বর্ণাবগুণ্ঠন মাঝে মাঝে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, তখন তার অসংখ্য অসংলগ্নতাই শুধু প্রকাশিত হয় নি, চোখে পড়েছে তার সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তার করুণ রূপান্তর।

আমার বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায়েই এসব আবিষ্কার আমি করেছিলাম। কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে নিজেকে তখন প্রতারিতও মনে করেছি আমি। অর্থ-লালসায় বিয়ে করার পর মানুষ যেমন করে জানতে পারে যে তার স্ত্রী নিতান্তই দরিদ্র, এ যেন তাই। মাঝে মাঝে আমি আমার স্ত্রীর মুখে এমন এক গভীর অথচ নির্বাক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি যার মধ্যে একই সঙ্গে ভয়, মর্মবেদনা আর স্বেচ্ছাচারিতার ছায়া পড়েছে বলেই মনে হয়েছে আমার। আবার ওর সঙ্গেই মিশে থাকত এক ধরনের অনাগ্রহ-ভাব, যার ভেতর স্পন্দিত হত যৌন আকর্ষণ। মাঝে মাঝে ওর মুখ-বিকৃতির ফলে দৈহিক অসামঞ্জস্য যেন অত্যন্ত তীব্রভাবেই ওর চোখের ওপর ফুটে উঠত। ওর সারামুখে তখন অংশত রুচিহীন আর অংশত বেদনাদায়ক এক অদ্ভুত মুখোসের হাস্যকর ছবি দেখতে পেতাম। বুঝতাম ওর বহিরাকৃতির কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে, বিশেষ করে মুখের দুপাশের দুটো রেখা, নাসারন্ধ্র আর চোখগুলোকে ও ইচ্ছাকৃতভাবেই বাড়িয়ে তুলছে। ঠোঁটে রঙ লাগানোর অভ্যেস ছিল আমার স্ত্রীর। সাধারণভাবে ও একটু ফ্যাকাসে। তাই ও গালে রুজ আর ঠোঁটে গাঢ় লাল রঙের ব্যবহারই পছন্দ করত। ওর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এই কৃত্রিম রঙের প্রলেপ কিন্তু চোখ, চুল আর গায়ের স্বাভাবিক বর্ণের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে যেত, মোটেই চোখে পড়ত না। কিন্তু মুখ বিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে এগুলোই আবার দৃষ্টিকটু-রূপে প্রকট হয়ে উঠত, নগ্ন বীভৎসতায় ঝকমক করে উঠত। যে মুখ একটু আগেই হয়তো প্রশান্তমাধুর্যে পরিপূর্ণ ছিল, তাই যেন হঠাৎ

আনন্দোৎসবের দিনে ব্যবহৃত মুখোসের বর্ণাঢ্যতা নিয়ে হাস্যকরভাবে প্রকাশ পেত। আবার এর সঙ্গেই যুক্ত হত বিকৃত ভঙ্গির সেই গুপ্ত-লালসা যা সাধারণত জীবদেহের আবেগতপ্ততায় বিকাশ লাভ করে।

মুখের মতই দেহও তার মোহময় রূপ ছড়িয়ে নানা ধরনের বিকৃতভঙ্গি করত। মাঝে মাঝে ভয়ে বা ঘৃণায় ওর সারা দেহ কুঞ্চিত হয়ে উঠত, তখনই দেখা যেত ওর শরীর পেছনের দিকে হেলে পড়েছে আকর্ষণ করার এক মনোরম ভঙ্গিতে, ঠিক যেমন করে নর্তকীরা বা রূপদক্ষ অভিনেত্রীরা দর্শকবৃন্দকে উদ্দীপ্ত করতে চেষ্টা করে, অনেকটা সেই রকম। মনে হত ও যেন কোন এক কাল্পনিক বিপদকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আবার ঐ একই মুহূর্তে এও ভেবে নেওয়া যেতে পারত বা ওর তীব্র দৈহিক আকুঞ্চনে থেকে এইটেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারত যে কোন বিপদ বা দৈহিক আক্রমণকে ও নিছক অবাঞ্ছিত মনে করছে না। ওকে মাঝে মাঝে বেশ শান্ত, সংযত আর অত্যন্ত মাধুর্যমণ্ডিতরূপে দেখা যেত কিন্তু পরমুহূর্তে ও যখন মুখভঙ্গি করে অশালীন আচরণ করত তখন স্বাভাবিকভাবেই ঐ একই মানুষটিকে আমার সামনে দেখছি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ হত।

প্রিয়জনের গুণের সঙ্গে দোষও যদি কিছু থেকে থাকে, সবকিছু একত্র করে তাকে ভাল লাগার চোখে দেখাই যে ভালবাসা, একথা আগেই বলেছি। মধুর মুহূর্তগুলিতে তার প্রশান্ত মধুর সুসঙ্গত আচরণ যেমন করে আমাকে আকৃষ্ট করেছিল বোধহয় তেমনিই আকৃষ্ট করেছিল তার ঐ অবাঞ্ছিত অঙ্গবিকৃতিগুলিও। বিশেষ ধরনের পারিপার্শ্বিকতায় আমার স্ত্রী যে আকর্ষণহীন একপ্রকার বিকৃত রূপ ধারণ করে, তা আমি জানতাম। ওর এই প্রকাশটুকু আমার কাছে কৌতুকাবহ মনে হয়েছে। ওর গুণগুলির মত এটিও ওকে ভালবাসার পক্ষে অন্যতম যোগ্য কারণ বলে মনে হয়েছে

আমার। আসলে ওকে ভাল না বাসার মত ইচ্ছা বা শক্তি কোনোটাই আমার ছিল না।

প্রসঙ্গত আমি একথা অবশ্যই স্বীকার করব যে আমাদের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতম মুহূর্তগুলিতে তার মুখ বা দেহের এ ধরনের বিকৃতি ঘটতে আমি দেখিনি। আমার কথাবার্তার সময়ে কখনও ওর ওই ধরনের বিকৃতি ঘটিয়ে মুখোসের মত বা দেহটিকে পুতুলনাচের পুতুলের মত করে তুলতে দেখেছি বলে স্মরণই হয় না। বরং একথাই বলা যায় যে আমাদের প্রেমঘন মুহূর্তগুলিতে ওকে এক অবিশ্বাস্য আর অবর্ণনীয় মাধুর্যের পূর্ণতায় লাভ করেছি। তখন তার ডাগর চোখগুলির সিক্ত আর বিস্ফারিত তারকায় যে চঞ্চল সুন্দর আবেদনের রূপটি ফুটে উঠত তার প্রকাশ ক্ষমতা যে কোনো সমৃদ্ধ ভাষার চেয়েও ছিল শক্তিশালী। ওর মুখের নীরব ভাষা ঠোঁটগুলির বঙ্কিম তরঙ্গে আর আসক্তির অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে এক খেয়ালী অথচ বুদ্ধি-দীপ্ত প্রাণসত্তার প্রকাশ করত। ওর সুন্দর অবিন্যস্ত কেশরাশির যোগ্য পরিমণ্ডলে মুখখানিকে একটি রহস্যময় অথচ অভয়প্রদ দর্পণের মতই মনে হত। ওর দেহে তখন নেমে আসত পরম সুন্দর এক নিষ্পাপ অবসাদ, যার মধ্যে থাকত না শক্তি বা লজ্জার কোনো স্পর্শ। সে যেন তখন সেই প্রতিশ্রুত ভূমিখণ্ড, যে তার সুদূর দিগন্তবিস্তৃত নদ নদী, পাহাড় পর্বত আর উপত্যকাগুলো নিয়ে প্রথম দৃষ্টির সামনে নিজেকে পরম রমণীয় আর আকর্ষণীয় ভাবেই মেলে ধরেছে। আবার অন্যদিকে তার মুখাবয়বের আর অন্যান্য অঙ্গের বিকৃতিগুলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত সাধারণ পরিবেশেও প্রকাশিত হত। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হতে পারে। গোয়েন্দাকাহিনী পড়ার ঝোঁক আমার স্ত্রীর খুব বেশী। লক্ষ্য করেছি, কাহিনীর পরিণতি যখন খুব ভয়াবহ আর উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছে তখনই ওর মুখ কুঞ্চিত আর বিকৃত হয়ে এসেছে। জটিল ঐ ঘটনার সমাপ্তির আগে ওর বিকৃতি কখনো স্বাভাবিকতা লাভ করতে দেখিনি। জুয়াখেলাতেও

আমার স্ত্রীর সমান আসক্তি। ক্যাম্পিওন, মন্টেকার্লো, সানরেমো —সর্বত্রই আমি ওর সঙ্গে থেকেছি। বাজী ধরার পর প্রতিবারে যখন চাকা ঘুরত, আর ছোট বলটি সংখ্যার পর সংখ্যা পেরিয়ে লাফিয়ে চলত, তখন ওর মুখের সেই অবাঞ্ছিত বিকৃতি দেখা দিত। ছুঁচে সুতো পরাতে গিয়ে, পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা যেখানে নদীর এমন ধার ঘেঁষে ছোট্ট ছেলেকে দৌড়োতে দেখে, এমন কি পিঠে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়লেও ওর মুখের সেই পরিবর্তন দেখা যেত।

সবশেষে আমি দুটো ঘটনার কথা বিশেষ করেই বলতে চাই যেক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে যে ওর এই অস্বাভাবিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে কোনো না কোনো জটিলতর কারণ। গাঁয়ের বাড়ির বাগানে আমরা একদিন বেড়াচ্ছিলাম। দেখলাম আগাছার একটা ঝোপ কি করে সামনের খোলা জায়গায় জন্মে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। ওটাকে তুলে ফেলার প্রবল চেস্টা করলাম। ওর শেকড়গুলো বেশ গভীরেই ছিল আর তাছাড়া ঐ ভেজা ঝোপটি কেবলই আমার হাত থেকে পিছলে যাচ্ছিল। কাজের ঝোঁকের মাঝখানে কেন জানি না হঠাৎ চোখ পড়ল স্ত্রীর দিকে। দেখি তার মুখে আর দেহে সেই অস্বাভাবিক কদর্য বিকৃতি ফুটে উঠছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার দৈহিক ওজনে পরাজিত হয়ে আগাছার ঝোপটা তার লম্বা সরল শেকড়গুলোসহ মাটি থেকে উঠে এল, ফলে আমিও কাঁকর-বাঁধানো রাস্তার ওপর পড়ে গেলাম চিৎ হয়ে।

আর একবার রোমে আমাদের বাড়িতে কয়েকজন বন্ধুকে খাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা। বন্ধুদের এসে পড়ার আগেই আমার স্ত্রী সান্ধ্যপোশাক আর জড়োয়া গয়নাগুলো পরে প্রস্তুত। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে কি-না দেখে আসার জন্য ও একবার রান্নাঘরে গেল। অবশ্য আমিও গিয়েছিলাম সঙ্গে। ওখানে গিয়ে দেখা গেল পাচিকাটির অবস্থা ভয়াবহ। বেশ একটা বড় আধমরা গলদা চিংড়ি আর তার ভীষণ নখগুলোর সামনে সে রীতিমত বিপন্ন। ওটাকে তুলে রান্নার

হাঁড়িতে ফেলতে সে কিছুতেই পারছে না। কোনো সোরগোল না করে টেবিলের পাশে গিয়েই আমার স্ত্রী চিংড়িটার পেছন দিকটা ধরে ফুটন্ত জলের ভেতর ডুবিয়ে দিল। অবশ্য এ কাজটি করতে গিয়ে চিংড়িটা আর উনুনটা থেকে যে তাকে সম্ভবমত দূরে থাকতে হয়েছিল, একথা ঠিক। এই কাজটি করার সময়ে অবশ্য ওর সেই অনভিপ্রেত আর হাস্যকর মুখবিকৃতির কিছুটা হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। ওর চকচকে সিল্কের সান্ধ্যপোশাকের আড়ালে উদ্দীপকভঙ্গিতে সেদিন ও নিতম্ব সঞ্চালন করেছিল। তার কিছুটা অর্থ সেদিন যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমার মনে হয় নানা ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার স্ত্রীর এমনি অসংখ্যবার মুখ আর দেহের বিকৃতি ঘটেছে। অবশ্য যা নিয়ে বাজী ধরে কিছু বলা যায় না এমন ঘটনাও কিছু থাকতে পারে। ভালবাসা আদান-প্রদানের বেলায় কিন্তু কখনো ঐ ধরনের মুখ বা দেহের আকুঞ্চন আমি লক্ষ্য করি নি। আর এই আকুঞ্চন এমন প্রগাঢ় নীরবতার মধ্যে রূপ-পরিগ্রহ করত যাকে নির্বাক নিস্তব্ধতার পরিবর্তে একটা অবনমিত ক্রন্দন বলেই মনে হয়েছে আমার। সবশেষে বলা যায় যে এই মুখ আর দেহবিকৃতি সৃষ্টি হত আশাতীত হঠাৎ কোন ভীতিজনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে, একেবারে বিদ্যুতের মত আকস্মিক আবির্ভাব। গভীরভাবে লক্ষ্য করে মনে হয়েছে এ হল দৈহিক আকর্ষণের সঙ্গে ঘনীভূত এক আতঙ্ক।

দুই

এতক্ষণ ধরে আমার স্ত্রীর কথাই আমি বলেছি, এবার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আর লক্ষণীয় সুষম অবয়ব যদিও আমার, তবে গড়নটা একটু পাতলা আর লম্বা ধরনের। খুব খুঁটিয়ে দেখলে আমার চিবুক আর মুখের গড়নে বোধ হয় কিছুটা খুঁত পাওয়া যাবে। তবে একথা সত্যি যে আমার মুখ আমার চারিত্রিক পরিচয়ের সাক্ষ্য মোটেই বহন করে না। তবে এ মুখ দৃঢ়তাব্যঞ্জক আর কিছু পরিমাণে বিপরীত গুণের পরিচায়ক। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করব যে চিন্তাভাবনার দিক থেকে কোনো গভীরতাই নেই আমার। আমি যখনই যাকিছু করি বা বলি তার ভেতর কোনো গোপনীয়তা থাকে না, ফলে পশ্চাদপসরণ করতে হলে আমার নতুন কিছু বলার বা করার থাকে না। আমার সবকিছুই সামনে, সাহায্য পাব এ আশায় কিছুই পেছনে রেখে আমি এগোই-না। অবশ্য এ থেকে বোঝা যাবে যে ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করেও আমি বেশ উৎসাহ আর উত্তেজনা বোধ করি। আমার এই কর্মোদ্যমকে একটা অনিয়ন্ত্রিত ঘোড়ার সঙ্গেই বরং তুলনা করা চলে যে একটা উঁচু বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু আগেই তার সওয়ারকে বিশহাত পেছনে ফেলে দিয়ে এসেছে। সওয়ার সেখানে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আসলে আমি যা বলতে চাই তা হল এই যে আমার এ উৎসাহ এমন একশ্রেণীর যার পেছনে ঘনিষ্ঠ কার্যকরীশক্তির বিশেষ অভাব থাকে, আর যার ফলে অনিবার্য-ভাবেই সব উৎসাহ নির্বোধ বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে দাঁড়ায়। আমি যে একটু আড়ম্বর ভালবাসি, কাজের চেয়ে কথাকেই দিই প্রাধান্য,

একথা অস্বীকার করার যো নেই। বিচার করলে দেখা যাবে যে আমার এই আড়ম্বর গড়ে উঠেছে ভাবপ্রবণতারই ওপরে। যেমন ধরুন আমি ভালবাসতে চাই আর আমি যে কারোর না কারোর প্রেমে পড়েছি একথা ভেবে নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করি। আসলে ওর মধ্যে প্রেমের কিছুই থাকে না, যা থাকে তা হল গভীর অনুভূতি নিয়ে বলা প্রেম সম্বন্ধে কিছু কথা। এইসব মুহূর্তে কিন্তু আমার বাক্‌রোধ হয়, আবেগ-গভীরতায় চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। আসলে আমার এই উৎসাহের যে বহিঃপ্রকাশ তার পেছনে আমি যা গোপন রাখি তা হল একধরনের তিক্ত আর তীক্ষ্ণ চাতুর্য যা নিঃসন্দেহে আমাকে প্রতারক করে তোলে। এ কোনো ধরনের শক্তিরই পরিচায়ক নয় বরং একে আত্মকেন্দ্রিকতাই বলা যায়।

লীডার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমায় যাঁরা জানতেন তাঁরা আমাকে একজন শিল্পরসিক বলেই স্বীকার করতেন। অবশ্য একথা আজও বলা যায়, তবে জানি না আর কতদিন এ পরিচয় আমি বহন করতে পারব। আসলে আমি হলাম সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের আর্থিক সচ্ছলতা আর অখণ্ড অবসর তাদের যে কোন শিল্পধারার অনুসরণে আর তা থেকে আনন্দরস আস্বাদনে যথেষ্ট সহায়তা করে। সমাজে আমি যে স্থানটি দখল করে আছি তার বিচারে আমার এই আত্মবিশ্লেষণ খুবই সঙ্গত। কিন্তু আমি যখন একাকী নিজের মুখোমুখি দাঁড়াই তখন মনে হয় আমার ভেতর কোন রকম শিল্পসত্তাই নেই। তখন আমি বেদনাতুর নৈরাশ্যের রাজত্বে একজন যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ ক্লিষ্ট যুবক মাত্র। আমার ঐ সময়কার মনের অবস্থা 'পো'র লেখা একটা কাহিনীর মধ্যে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ওই কাহিনীতে 'পো' এক জেলের রোমাঞ্চকর অভিযান বর্ণনা করেছেন। জেলেটি নৌকো নিয়ে সমুদ্রের ঘূর্ণাবর্তে গিয়ে পড়েছিল। আবর্তে পাক খেয়ে পুরনো ভাঙা জাহাজের ধ্বংসাবশেষগুলোর

পাশ দিয়ে কেবলই নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। তার সামনে পেছনে, ওপরে নীচে ওই জাহাজের ভাঙা টুকরোগুলো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে জানে ঐ ভাঙা টুকরোগুলো কোথাকার; তাই সে স্পষ্টই বুঝতে পারছিল যে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে আবর্তের তলদেশের দিকে নেমে যাচ্ছে আর সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে মৃত্যু। আমার জীবনকেও তেমনি একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণাবর্ত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারত। আমিও যেন এক অন্ধকার আবর্তের গভীরে পাক খাচ্ছিলাম। আমি দেখছিলাম, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালবাসার জিনিসগুলোই পাক খেয়ে ঘুরছে, সামনে পেছনে, উপরে নীচে সবদিকে। অনেকের মতে ওগুলোই নাকি ছিল আমার আশ্রয় কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতাম যে কাহিনীর ভাঙা জাহাজের টুকরোগুলোর মত ওরা আচ্ছন্ন হয়ে কেবলই পাক খাচ্ছে। পার্থিব জগতের যা কিছু সুন্দর যা কিছু মধুর তার সবটুকু নিয়ে আমি যে কেবলই বৃত্তাকারে আবর্তিত হচ্ছি এ বেশ অনুমান করতে পারতাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ঘূর্ণায়মান অকেজো জিনিসগুলোর জন্য যেখানে অনিবার্য ধ্বংস অপেক্ষা করে আছে, আবর্তের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীরতার দিকে আমি অপলক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। এক একবার মনে হয়েছে যে আবর্তটি সংকীর্ণ হয়ে তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলছে আর বোধহয় চাইছে আমাকে আমার প্রাত্যহিক জীবনের নিস্তরঙ্গ অধ্যায়ে ফিরিয়ে দিতে। আবার কখনও মনে হয়েছে আবর্তের তীব্রতায় দ্রুতবেগে আমি ক্রমশই নেমে যাচ্ছি আর সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাচ্ছে পার্থিব জগতের সবকিছু চিন্তাভাবনা। এইসব মুহূর্তগুলিতে নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে হারিয়ে ফেলবার কামনা অবশ্যই আমি মনে মনে পোষণ করেছি। এই ধরনের চরম মুহূর্ত আমার জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে বহুবার। বিশ থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এমন একটি দিনও আমার কাটেনি যে দিন আমার মনে উদিত হয়নি আত্মহত্যার

কামনা। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার ইচ্ছা সত্যিই হয়তো আমার ছিল না, (কারণ তা থাকলে ওটা অবশ্যই ঘটত) কিন্তু এই বিশেষ চিত্তবৃত্তি আমাকে আবিষ্ট করে আমার মনোরাজ্যের বিশেষ বিশেষ প্রবণতার সৃষ্টি যে করেছে একথা নিশ্চয় করে বলা যায়।

এর প্রতিকারের কথা আমি অনেক সময় ভেবেছি। অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে রক্ষা পাওয়ার মাত্র দুটো পথ খোলা আছে,—নারীর প্রেম আর শিল্প কর্মের প্রতি আকর্ষণ। যে ভাবে দুটো পথের উল্লেখ করলাম তা বেশ হাস্যকর মনে হতে পারে। যেমন অবলীলাক্রমে এই মহামূল্যবান জিনিসগুলোর উল্লেখ করলাম তাতে নিশ্চয় মনে হতে পারে যে এগুলো হাতুড়ে বৈদ্যের সাধারণ কোন ওষুধ, দোকান থেকে কিনে আনলেই হল। আসলে যখন আমার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ তখনই এ ধারণা আমার সুস্পষ্টভাবে তৈরী হয়েছে যে জীবনসমস্যার সমাধান এই দুটি পথেই কেবল আসতে পারে। তাছাড়া পৃথিবীর যে কোন মানুষের মতই এদুটিকে করায়ত্ত করার অধিকার আমার আছে। কোনো কোনো রঙীন মুহূর্তে এ ভ্রান্তিও আমার হয়েছিল যে রুচি আর প্রতিভার স্বাভাবিক শক্তিতে শিল্পরস আস্বাদনের ক্ষমতা আমার জন্মগত।

কিন্তু কাজের বেলায় ঘটল বিপরীত। কোনো বইয়ের দু-তিন পাতার ওপারে এগোতেই পারলাম না আমি। আর নারীর ক্ষেত্রে তো সে গভীরতায় নামতেই পারলাম না যেখান থেকে উভয়ের বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠ হতে পারে বা বাইরের লোকেও আমাদের উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারে। এর ফলে সৃজনীশক্তি আর ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্রে আমার যে ক্ষতি ঘটল তা হল উচ্ছ্বসিত উদ্যমের অঙ্কুরে বিনাশ। অনিচ্ছুক ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে-আনা একটি চুম্বন বা দু-তিনটি পৃষ্ঠা দ্রুত লিখনের পর হয়তো ভেবেছি যে সমস্যার সমাধান বোধহয় হয়ে গেল। কিন্তু তারপর? তারপর সেই নারীর সঙ্গে ভাবপ্রবণ বাচালতায় মগ্ন হয়ে তাকে আমার থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি। রচনার

ক্ষেত্রেও তেমনি আমার সাময়িক নৈপুণ্য গভীর অনুপ্রেরণার অভাবে হয় ভ্রান্তবিতর্কে নয় অর্থহীন বাগাড়ম্বরের অতলে তলিয়ে গেছে। আমার প্রশংসনীয় প্রথম উদ্যম চিরকালই নিজেকে আর অপরকে প্রতারিত করেছে, এমন এক অসংলগ্ন নিরাশ্রয় দুর্বলতায় নিমজ্জিত করেছে আমাকে যা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তখন মনে মনে ভেবেছি যে প্রেমে পড়ার বা লেখার জন্য আগ্রহ আমার যে পরিমাণ কাজের ক্ষেত্রে ঠিক ততটা এগোন আমার উচিত হয় নি। কখনও কখনও কোন নারীকে প্রেমে পড়ার জন্য এগিয়ে আসতে দেখেছি, কিন্তু বুঝি নি সেটুকু আমার প্রতি করুণায় না তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তবে সেও শেষ পর্যন্ত প্রতারণা করেছে আমাকে। আমার লেখা পাতাগুলোও তেমনি আমাকে মাঝে মাঝে এগিয়ে যেতে প্রেরণা জুগিয়েছে, বাধাও দিয়েছে। বলতে পারি, একটিমাত্র ভাল গুণ আমার আছে, তা হল আমার বিবেক। সে আমার ভ্রান্ত পথযাত্রার যথার্থ স্থানেই বাধা দিয়েছে চিরকাল। তখন একদিকে লেখা পাতাগুলোকে নির্মমভাবে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি, অন্য দিকে কোনো-না-কোনো অজুহাতে নির্দিষ্ট মহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাইনি। এইভাবে ব্যর্থ চেষ্টার অবসরে কখন আমার যৌবন গেছে হারিয়ে।

তিন

কোথায় আর কেমন করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আমার দেখা হয়, তা জানার দরকার নেই। হয়তো কোনো বসবার ঘরে, জল দেবার জায়গায় বা ঐরকম কোথাও নিশ্চয়। ওর বয়স প্রায় আমার সমান ছিল। আর এও মনে হয়েছিল যে নানা দিক থেকে আমাদের উভয়ের জীবনের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য আছে। কয়েকটা দিক থেকে সত্যিই সামঞ্জস্য ছিল, বিশেষ করে যেগুলো বাইরের লক্ষণ। আমার মত তারও ছিল আর্থিক সচ্ছলতা, অখণ্ড অবসর আর আমারই ধরনে জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল সে। তার মেলামেশার বৃত্তটিও ছিল আমারই রুচিমাফিক। ক্ষণিক আগ্রহের আলোকে আমি স্থির করে নিয়েছিলাম যে এই সামঞ্জস্যগুলো খুবই অর্থপূর্ণ। হয়তো বা আমি আমার আত্মার দোসরই পেয়ে গেছি, এমনি ভেবেছিলাম। তার জন্মভূমি 'মিলান' শহরে, অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল এমন এক-জনের সঙ্গে যাকে সে ভালবাসতে পারে নি। সে বিয়ে বছর দুই টিকেছিল। তারপর তারা বিচ্ছিন্ন হয় আর সুইজারল্যাণ্ডে এসে আইন মত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে ও একাই ছিল এতদিন। প্রথম-বার যখন ওকে দেখি তখনই সে স্বীকার করেছিল যে সে তার অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার সে চাইছিল সত্যিকার সেই প্রেমের বন্ধনে বাকী জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে। এই স্বীকৃতি থেকেই আমার ধারণা দৃঢ়তর হল যে এ হল সেই নারী যাকে আমি এতকাল খুঁজে বেড়িয়েছি। ভাবাবেগহীন সরলতায় যেভাবে সে তার অন্তর মেলে ধরেছিল তাতে মনে হয় নি যে ও তার প্রেমস্পর্শহীন জীবনের করুণ কামনাটি ক্ষণিক আবেগে প্রকাশ করছে। ওর মনের

ভাব একটি বাস্তবধর্মী প্রস্তাব হিসেবেই ও প্রকাশ করেছিল। এর ভেতর তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে আমি আমার মনের প্রতিফলনই দেখেছিলাম আর চিরাভ্যস্ত আবেগপ্রবণতায় স্থির করে নিয়েছিলাম যে এই নারীই আমার ঘরনী হবে।

লীডা খুব বুদ্ধিমতী নয়। তবু সে তার মাঝারি ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে আমার জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। সে তার অভিজ্ঞতা দিয়ে এমন করে প্রশ্রয় আর বিদ্রূপকে মানিয়ে মিশিয়ে নিতে পারত যা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের যোগ্য। ও আমার চোখে একজন রহস্যময়ী কর্ত্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে ওর দিক থেকে সামান্য অনুভূতি বা উৎসাহ আমার কাছে আশাপ্রদ সম্পদ বলে মনে হত। তখন কিন্তু আমার এমনি এক ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে আমিই ওকে প্ররোচিত করেছি। এখন একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত সেই-ই প্রথম গ্রহণ করেছিল, আর তা যদি না হত এ বিবাহ ঘটতই না। তখন চলছিল আমার পূর্বরাগের পালা। ধারণা হয়েছিল যে এর মত দীর্ঘ আর সুকঠিন অধ্যায় আর নেই। ঠিক এমনি সময়ে সে নিজেকে আমার হাতে এক রকম জোর করেই সমর্পণ করে দিল। অপর যে-কোন নারীর ক্ষেত্রে হলে এই আত্মসমর্পণকে আমি তার স্বাভাবিক ধর্ম বলে ধরে নিয়ে তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতাম। কিন্তু এর ক্ষেত্রে এই ব্যবহারটি সম্মতিসূচক উৎসাহ দানের মূল্যবান আশাপ্রদ আচরণ বলেই ধরে নিতে হয়েছিল আমাকে। ওকে ঘনিষ্ঠ করে পাওয়ার পরও যে ওর রহস্যময় কর্তৃত্ব অটুট থাকছে এটি বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি। ওকে নিজের আয়ত্তে পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি এমনটি কখনও বুঝতে পারি নি। পূর্ণ পরিতৃপ্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর একটি কথা বা একটু অঙ্গভঙ্গিতে আবার মনে হয়েছে ওকে আমি হারাচ্ছি। প্রাপ্তি আর নৈরাশ্যের এই পালাবদল চলেছিল বিয়ের দিনটি পর্যন্ত। ইতিমধ্যে ওকে আমি ভীষণ ভালবেসে ফেলেছিলাম আর স্থির

করেছিলাম যে আগের ক্ষেত্রগুলোতে যেমন করে ব্যর্থ আর নিরুৎসাহিত হয়েছি, প্রেমের এ ক্ষেত্রে তেমনি সমাধি রচনা কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। যাই হোক, নানা আশঙ্কায় বিয়েটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইলাম। ভেবেছিলাম অত্যন্ত সহজ এ কাজ। ও যে অবিলম্বে স্বীকার করবে এই বিশ্বাস নিয়ে ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলাম। কিন্তু আমি যেন কোন মহৎ আর গুপ্ত আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছি এমনি ভাব দেখিয়ে ও আমাকে প্রত্যাখ্যান করে বিস্মিত করল। প্রত্যাখ্যাত হয়ে মনে হল আমি আমার সেই পুরোনো হতাশার গভীর তলদেশে আবার গিয়ে পড়েছি। ওকে পরিত্যাগ করলাম আমি। কোন অবলম্বনই আর রইল না আমার। ভেবে দেখলাম আমি যদি সত্যিই কাপুরুষ না হই তবে আত্মহত্যা করার উপযুক্ত সময় এবার এসেছে। কয়েক দিন পরে হঠাৎ ও টেলিফোন করে জানতে চাইল কেন ওর সঙ্গে এর মধ্যে দেখা করতে যাই নি। বিস্মিত হলেও আমি দেখা করতে গেলাম। স্বাগত জানালে ও আমাকে। তারপর মধুরভাবে অথচ উদ্ধত ভর্ৎসনার সুরে প্রশ্ন করল, চিন্তা করার অবকাশ না দিয়ে ওকে পরিত্যাগ করেছি কেন। এই আলোচনার উপসংহারে ও আমাকে জানিয়ে দিল যে আমার সঙ্গে বিয়েতে তার সম্মতি আছে। এর ঠিক দু সপ্তাহের মধ্যেই আমাদের বিয়ে হয়ে যায়।

আমার অপরিচিত এক পরমানন্দময় অধ্যায়ের সূচনা হয় ঠিক এরই পর থেকে। আমি গভীরভাবেই লীডাকে ভালবাসতাম। তবু আশঙ্কা হয়েছে আমাদের উভয়ের ভালবাসা কোন মুহূর্তে হয়তো শেষ হয়ে যাবে। তাই প্রাণপণে চেষ্টা করেছি দু জনের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলতে। সাধ্যমত চেষ্টা করেছি দুটি জীবনকে একসূত্রে গ্রথিত করতে। নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে ওর কোন ধারণা নেই ভেবে ওকে বলেছিলাম যে এ সম্বন্ধে ওর কিছু শিক্ষা দরকার। এ বিষয়ে শিক্ষা নিতে আর দিতে যে আনন্দ পাওয়া যায় সে কথাও ওকে

জানিয়েছিলাম। ঠিক এই সময় আমি আবিষ্কার করলাম যে ও শুধু আশাতীতভাবে অনুগতই নয়, বুদ্ধিমতীও। যাই হোক, উভয়ের সুবিধে মত একটা পরিকল্পনা খাড়া করা গেল আর সেই সঙ্গে পড়াশোনার জন্য একটা সময়-সূচীও। এরপর শুরু হল আমি যা জানি আর পছন্দ করি তা তাকে শেখানো আর তা থেকে আনন্দ পেতে সাহায্য করা। সে কতটা আমাকে অনুসরণ করতে পেরেছিল জানি না, তবে আমি যতটা আশা করেছিলাম ততটা নয় নিশ্চয়। ওর কর্ত্রীসুলভ প্রভাব আমি অনুভব করতাম বটে তবু ও যখন বলত, 'এ গানটি তো বেশ,' 'এ কবিতাটি কিন্তু সুন্দর,' 'এই অংশটা আবার পড়ে শোনাও তো' 'ওই রেকর্ডখানা আবার বাজিয়ে শুনি এস,' তখন মনে হত আমি ওকে জয় করেছি। আমাদের অবকাশটুকু ভরে দেবার জন্য ওকে ইংরেজীও শেখাচ্ছিলাম আমি। ওর ছিল প্রখর স্মৃতিশক্তি আর ভাষা আয়ত্ত করার প্রবণতা। তাই ইংরেজী ও ভাল করেই শিখতে লাগল। ওর সদিচ্ছা আর গভীর প্রেমের প্রভাবে আমার পক্ষে ইংরেজী পঠন, ব্যাখ্যা আর অনুশীলন গুলো যেন মনোরম আর মূল্যবান হয়ে উঠতে লাগল। যদিও ও ছিল ছাত্রী আর আমি শিক্ষক, কিন্তু ও ধীরে ধীরে যত পাঠের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল, আমিও যেন এক ছাত্রজনোচিত অনুভূতিতে আবিষ্ট হতে থাকলাম। এই জাতীয় উত্তেজনার কারণও ছিল। কারণ হচ্ছে এই যে আমাদের পাঠ্য বিষয় ছিল প্রেম। তাই দিনের পর দিন মনে হতে লাগল যে আমি এতে পারদর্শী হয়ে উঠেছি।

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের প্রেমজীবনই ছিল আমাদের সুখ শান্তির দৃঢ় ভিত্তি। আর এই প্রেমজীবনের সঙ্গে আজকের দিনের রুচির সংস্রবই ছিল না। ও যে মাঝে মাঝে বিকৃত মুখভঙ্গি আর অঙ্গভঙ্গি করে এ কথা আগেই বলেছি। আমাদের পরস্পরের প্রেম-নিবেদনের বেলায় এগুলোকে খুব একটা বেমানান মনে হত না। আজ এ কথা নিশ্চয় করে বলব যে ওর সৌন্দর্যকে উপভোগ করার

বৃত্তে আবার সেই পূর্বের মত আবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ আবর্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন আর ভীতিপ্রদ নয়; বরং মনোরমভাবেই মন্থর আর উজ্জ্বল। বিছানায় আমার পাশেই বিছিয়ে দেওয়া ওর শিথিল দেহের প্রমত্ত সৌন্দর্য কত বার ও আমার সচেষ্ট দৃষ্টির সামনে মেলে ধরেছে। তবু ওই রূপের সংজ্ঞা আমি কোনো রকমেই নির্দেশ করতে পারি নি। নরম বালিশের মধ্যে মাথাটিকে প্রায় ডুবিয়ে দিয়ে ও কতবার বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়েছে আর আমি ওর কোমল লম্বা চুলের সুন্দর গুচ্ছগুলি এলোমেলো করে দিয়েছি, পরমুহূর্তে আবার দিয়েছি সুবিন্যস্ত করে। ওগুলোর ছলনাময় চঞ্চল রূপ বিশ্লেষণের কত ব্যর্থ চেষ্টাই না আমি করেছি! ওর নীল ডাগর চোখগুলির মধ্যেও মধুর চাঞ্চল্য কোথায় লুকিয়ে আছে তাও আমি কম খুঁজি নি। কতবার বিলম্বিত চুম্বন সুতীব্র আবেগে ওর ওষ্ঠাধরে এঁকে দিয়ে দেখতে চেয়েছি তার সংবেদন আমার ঠোঁটগুলো কতক্ষণ ধরে রাখে। বুঝতে চেয়েছি ওর কম্পিত ওষ্ঠের ঠিক আকৃতিটি কেমন। অর্থ সন্ধান করতে চেয়েছি চুম্বনের পর ওর মুখের ভাঁজে ছুঁয়ে থাকা দুর্লভ হাসির—যে হাসি একমাত্র প্রাচীন গ্রীক মূর্তির মুখেই লক্ষ্য করা যায়। আমি যখন গভীর সুখে ডুবে ছিলাম তখন স্ত্রীর সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করা বোধহয় উচিত ছিল। ওর দিক থেকে প্রেম স্বতোৎসারিত ছিল না। ওর ব্যবহারের মধ্যে ধরা পড়ত যে ও চাইছে আমাকে কেন জানি না বেশ একটু খুশি করে চলতে, এমনকি হাল্কা ধরনের চাটুকারিতার ভেতর দিয়ে আনন্দ দিতে। ওর এই আচরণটিকেই আমি সদিচ্ছা বলব। কতকগুলো পূর্বকৃত কাজই গোপন করা নয়, মাঝে মাঝে একটু ছলনা বা বিশ্বাসঘাতকতাও প্রয়োজন হয় এই ধরনের সদিচ্ছা বজায় রাখতে। আমি কিন্তু ওর এই সদিচ্ছাটিকে ভালবাসার প্রতীকরূপেই গ্রহণ করেছিলাম, তাই ওর আড়ালে কী লুকিয়ে আছে বা এই সদিচ্ছার অর্থ কি এ নিয়ে অনুসন্ধান করি নি।

আসলে পরম সুখের মধ্যে আমি একান্তই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছিলাম। আমার জীবনে এই প্রথম প্রেমকে পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিলাম আমি আর তাই অদূরদর্শী উৎসাহের প্রাবল্যে আমার মনের সব অনুভূতিগুলোকে ওর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম।

চার

আমার সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার কথা কোনো দিনই আমি স্ত্রীকে শোনাই নি। ওগুলো ও হয়তো বুঝবে না। আর তাছাড়া ওগুলো নেহাতই আকাঙ্ক্ষা, কতকগুলো ব্যর্থ চেষ্টার সমষ্টি মাত্র। সে বছর সমুদ্রতীরে আমরা গরমের সময়টা কাটাতে কাটাতে সামনের হেমন্ত আর শীতকাল কী ভাবে কাটাব তারই পরিকল্পনা করছিলাম। ঠিক মনে' নেই কী করে কথায় কথায় আমার সেই নিষ্ফল সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছিলাম একবার। হয়তো-বা বিয়ের পর যে সুদীর্ঘ আলস্যের মধ্যে এসে পড়েছি সেই প্রসঙ্গেই কথাটা বলে থাকব। তক্ষুণি ও বলে উঠল, 'কিন্তু সিলভিও, তুমিতো একথা কোনো দিন আমাকে বল নি!' বললাম, ওকে যে ওসব কথা বলার প্রয়োজনই বোধ করিনি তার কারণ উল্লেখযোগ্য কিছুই এতদিন লিখতে পারি নি বলে। ও কিন্তু তার স্নেহসিক্ত আগ্রহে আমার কিছু একটা রচনা ওকে দেখানোর জন্য জিদ করতে লাগল। তার এই অনুরোধে আমি তক্ষুণি বুঝতে পারলাম যে তার এই কৌতূহল আমার ওপরে স্তাবকতারূপে কাজ করে আমাকে অত্যন্ত খুশি করেছে। ওর মতামতের মূল্য অন্তত যে-কোনো পেশাদার সাহিত্যিকের সমান। আমি খুব ভাল করেই জানতাম যে এ বিষয়ে ওর জ্ঞান গভীর নয় আর রুচিও তেমন নির্ভরযোগ্য নয় তাই তার নিন্দা বা প্রশংসায় সত্যিকার কোনো মূল্যই থাকতে পারে না। তবু বুঝলাম এরপর লেখার কাজ আমি চালিয়ে যাব কিনা তা নির্ভর করছে ওরই ওপর। ওর জেদের উত্তরে কিছুক্ষণ বাধা সৃষ্টির ভান করলাম আমি। শেষে বছর-দুয়েক আগে লেখা একটা বাতিল-করা গল্প ওকে শোনাতে

রাজী হলাম। কিন্তু ওকে বার বার সাবধান করে দিলাম যে এ লেখাগুলোর কোনো মূল্যই নেই সত্যিকারের। কিন্তু ওর কাছে পড়তে গিয়ে আমার মনে হল গল্পটিকে আগে যতটা খারাপ ভেবেছিলাম তা নয়। তাই একটু ভাবব্যঞ্জক দৃঢ়তার সঙ্গেই লেখাটি পড়লাম আর এর প্রভাব আমার স্ত্রীর ওপর কী ধরনের হচ্ছে জানবার জন্য মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে সে শুনছিল, কিন্তু এই শোনার কোনো প্রতিক্রিয়া তার ভাবভঙ্গিতে ধরা পড়ে নি। পড়ার শেষে কাগজগুলোকে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, কেমন, দেখলে তো, বলে-বেড়ানোর মত লেখা এগুলো নয়?' তবু ওর উত্তরটুকু শোনবার জন্য এক অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠায় বসে রইলাম আমি। আবেগগুলিকে গুছিয়ে নেবার জন্যই যেন ও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর, আমি যে আমার প্রতিভার যথেষ্ট মূল্য না দিয়ে অন্যায় করেছি এই কথাটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করল সে। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও গল্পটি ওর বেশ ভাল লেগেছে, একথাও সে জানালো। শুধু কি তাই? ভাল লাগার কারণ হিসেবে কয়েকটি যুক্তিও উপস্থিত করল আমার স্ত্রী। কুশলী শিল্পীর সমালোচনার মত না হলেও (তাই বা হয় কী করে?) ওর কথায় আমি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। সাধারণ রুচিসম্পন্ন মানুষের উপস্থাপিত সাধারণ যুক্তির মত শোনালেও আমার যেন মনে হল সংস্কৃতিবান কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির যুক্তি অপেক্ষা ওগুলি কোনো অংশেই কম নয়। সত্যিকথা বলতে কি উপকারের চেয়ে আমার অপকার সবচাইতে বেশী যাতে হয়েছে তা হল আত্মসমালোচনার ক্ষেত্রে আমার মাত্রাধিক প্রবণতা। বোধহয় আমার ক্ষেত্রে যে বিশেষ জিনিসটির অভাব ছিল তা প্রতিভা নয়, সস্নেহ উৎসাহ, যা এই মুহূর্তে আমার স্ত্রী আমার ওপর অকৃপণভাবে বর্ষণ করছিল। যারা স্নেহ করে তারা প্রশ্রয় দেয়, তাই তাদের কাছে যা সাফল্য তার মধ্যে অনেকটুকুই

থাকে পক্ষপাত, অতিরঞ্জন। আমাদের মধ্যে প্রতিভার যে বীজকে অপরে নির্মমভাবে অস্বীকার করে তাকেই মূল্য দিতে এগিয়ে আসে আমাদের মা বোন আর সঙ্গিনীরা। আপনজন বলে বোধহয় তাদের ঐ উৎসাহে তৃপ্তি পাইনে আমরা মোটেই। বরং মনে হয় প্রকাশ্যে নিন্দা করলেই বুঝি ভাল লাগত আমাদের। কিন্তু আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে আমার অনুভূতি ছিল ভিন্ন ধরনের। আমার প্রতি প্রেমে আচ্ছন্ন না হয়েই যে সে আমার লেখা গল্পটিকে পছন্দ করেছিল, এই স্পষ্ট ধারণাই আমার হয়েছিল। করুণা দেখানোর জন্য প্রশংসা করে নি সে। তার প্রশংসা ছিল সত্যিই যুক্তি আর বিবেচনাভিত্তিক। কিছুটা ভীরুতার সঙ্গেই শেষে প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে তুমি বলতে চাও যে লেখার কাজ আমি চালিয়ে যাব, আর এতে লেগে থাকব? ভাল করে ভেবে দেখ তুমি কী বলতে চাও। আমি তো কম করে বছর দশেক কাজ করেছি, কোন ফল পাই নি। যদি বল তবে অবশ্যই লেখা চালিয়ে যাব, তবে বন্ধ করতে বললে এখনি তাই করব, কলম আর এ জীবনে ছোঁব না।'

ও হেসে বলল, 'তুমি আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব চাপিয়ে দিচ্ছ।' আমি জিদ করতে শুরু করলাম, 'ধরে নাও আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্কই নেই, আমি একজন আগন্তুক মাত্র,—এবার যা ভাবছ তাই বিনা দ্বিধায় বলে ফেল।'

'আমি তো বলেইছি', ও উত্তর দিলে, 'লেখার কাজ তোমার চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'সত্যি বলছ?'

'নিশ্চয়।'

একটু চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'দেখ, একটা কাজ করি এস। রোম না গিয়ে টাসক্যানির শহরতলির বাড়িতেই মাস দুই কাটিয়ে আসি চল। ওখানেই তুমি কাজ শুরু করতে পারবে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওখানেই সত্যিকার ভাল কিছু তুমি লিখতে পারবে।'

'কিন্তু তুমি ? তোমার একঘেয়ে লাগবে না ?'

'কেন ? তুমিতো আমার সঙ্গেই থাকছ ,ওখানে ;—তাছাড়া আমার দিক থেকে এ একটা পরিবর্তনও হবে, অনেক দিন শান্ত নির্জন জীবনের স্বাদ পাই নি।

এ কথা আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে ওর যুক্তি বা উৎসাহ-দান কোনোটাই আমাকে ততটা অনুপ্রেরণা জোগায় নি, যা জুগিয়েছে তা হল এক ধরনের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। মনে হল জীবনে এই প্রথম একটি শুভ সদয় গ্রহের দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছে। আশাতীত সৌভাগ্যের এই সম্ভাব্য মুহূর্তে আমার উচিত শুভলগ্নের সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা। যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় আমি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছি তা রূপ নিয়েছে আমার স্ত্রীর মধ্যে। এবার নিশ্চয় প্রেমের অনুসঙ্গী হবে আমার সাহিত্যিক সৃজনধর্মিতা। আমি যে ঠিক পথে চলেছি আর আমাদের মিলনের শুভফল যে এখনো একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে রসিকতার সঙ্গে বললাম যে এখন থেকে ও-ই হবে আমার সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাত্রী প্রেরণা। যা আমি বলতে চাইলাম তা ও বুঝল বলে মনে হল না, কারণ বারে-বারে ও জানতে চাইল আমার সিদ্ধান্তের কথা।

উত্তরে ওকে জানিয়ে দিলাম ওর সিদ্ধান্ত মত কয়েকদিনের মধ্যেই শহরতলির বাড়ির জন্য রওনা হয়ে যাব আমরা। এক সপ্তাহের পরে সত্যিই আমরা রিভিয়েরা ছেড়ে টাসক্যানির পথে রওনা হলাম।

পাঁচ

শহরতলির বাড়িটা ছিল একটা ফাঁকা জায়গায়। ওর পাশেই কয়েকটা মাঝারি আকারের পাহাড় আর সামনে বিস্তীর্ণ কর্ষিত ভূমি। পত্রবহুল বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ একটি পার্ক ছিল বাড়িটির চারপাশে। ফলে বাড়িটির ওপরতলার জানালা থেকেও সামনে দেখা যেত না কিছুই। খামার বাড়ি, চাষের মাঠ প্রভৃতির একপাশে বাড়িটা, এ কথা মনেই হত না। বরং মনে হত গভীর বনের মধ্যে ওটি একটি আশ্রম। একটু দূরেই ছিল বেশ বড় একটা গ্রাম। বাড়ির পেছনে এক পাহাড়, তার ওপর একটা শহর। ওটি হল সব চাইতে কাছের শহর কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে করে ওখানে পৌঁছতেই লাগত প্রায় এক ঘণ্টা। বড় বড় প্রাসাদ, গীর্জা, মঠবাড়ি, যাতুঘর আর চারদিকে যুদ্ধের জন্য তৈরী প্রাচীর এই নিয়ে ওটি একটি মধ্যযুগীয় শহর বলে মনে হত। নীচের সমতল অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্যের কল্যাণে যে কুশ্রী আধুনিক গ্রামটির সৃষ্টি হয়েছে, টাসক্যানির এ শহর ছিল সেগুলো থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

পার্কের গাছপালাগুলোর দিকে তাকিয়ে বেশ অনুমান করা যায় যে প্রায় একশ বছর আগে বাড়িটা তৈরী হয়েছিল। সাদাসিদে চারতলা বাড়ি, প্রতি তলায় তিনটে করে বড় বড় জানালা, সামনে কাঁকর বিছানো একটু খোলা জায়গা। তার দুপাশে দুটো কাঠ-বাদামের গাছ। এখান থেকেই এঁকে বেঁকে বেরিয়ে গেছে একটা গাড়ি-চলার রাস্তা পার্কের দরজা অবধি। দরজা পেরিয়ে ওই পথটি পাঁচিলের ওপারে আবার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। প্রচুর গাছপালা আর ছায়াঘন বিশ্রামকুঞ্জে ভরা সামনের পার্কটি।

পার্কের প্রান্তে গোটা দুই খামার বাড়ি। ওগুলো কিন্তু একটি পাহাড়ের চুড়োয়, তাই ওখান থেকে সামনের দিগন্তবিস্তৃত সমতল-ক্ষেত্রের ওপর এক নজরে চোখ ফেলা খুবই সহজ। শহরতলির এই ভিলা বা বাড়িটি থেকে চাষীরা যে তাদের চাষের বলদদের তাড়ানোর জন্য অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলত তা শোনা যেত। তাদের কিন্তু দেখতে পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে তাদের মুরগীগুলো খাবার খুঁজতে খুঁজতে পার্কের দরজা অবধি এসে পড়ত।

বাড়িটার ভেতরে আসবাবপত্র ছিল একেবারে ঠাসা। ওগুলোর মধ্যে গত শতাব্দীর সব ধরনের শিল্পকর্মেরই নমুনা ছিল। এই বাড়ির শেষ বাসিন্দা আমার প্রমাতামহী, প্রায় শতখানেক বছর বয়সে মারা গেছেন। উনি প্রায় পিঁপড়ের মত ধৈর্য আর লালসা নিয়ে এত জিনিস সংগ্রহ করে গেছেন যা দিয়ে এই আকারের দুটো বাড়ি ভরে তোলা যায়। ড্রয়ার, আলমারী, সিন্দুক এমনি সব জিনিস এক একটি ঘরে যা ছিল তা হল প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ। ওগুলোর ওপর আবার চীনে মাটির জিনিস, কাপড় জামা, পুরনো কাগজ, ছবির অ্যালবাম, রান্নার বাসন, এমনি নানা ধরনের জিনিস স্তূপীকৃত। খুব অন্ধকার শোওয়ার ঘরগুলোয় ছিল চার খুঁটিওয়ালা চৌকি, বড় বড় আলমারি আর ফিকে-হয়ে-আসা পারিবারিক ছবি। বসবার ঘর ছিল অসংখ্য। একটা পাঠাগারও ছিল, যার তাকগুলো ছিল পুরানো বইতে ভর্তি। ওগুলোর বেশীর ভাগই পাঁজি, ধর্মগ্রন্থ আর সমালোচনার বই। বিলিয়ার্ড টেবিল-পাতা একটা ঘরও ছিল, যদিও টেবিলটা ছিল জরাজীর্ণ, কাপড়গুলো ছেঁড়া আর বল ছিল না একটাও। ওই ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ-করা নোংরা আসবাবগুলোর মধ্যে চলাফেরাই ছিল শক্ত কাজ। ওই আদ্দিকালের আসবাবগুলোই যেন ও বাড়ির সত্যিকারের বাসিন্দা আর আমরা নেহাত অনধিকারপ্রবেশকারী। যাই হোক অনেক চেষ্টায় দোতলার একটা বসবার ঘর সাফ করিয়ে তার রাজকীয় ধরনটি ফিরিয়ে আনা গেল। ওটাকেই আমার পড়ার

ঘর করলাম। দুটো ভাল আরাম চেয়ার ছিল নীচের তলার বসবার ঘরে। ওটাকেই বসবার ঘর হিসেবে পছন্দ করল আমার স্ত্রী; আর শোবার জন্য আমরা প্রত্যেকে একটা করে ঘর বেছে নিলাম।

শ্রমপরায়ণ সন্ন্যাসীদের মতই প্রথম দিনটি থেকে আমরা একটা নিয়মিত জীবন যাপন করতে শুরু করলাম। সকাল বেলায় বাড়ির পুরোনো চাকর ট্রে'তে করে খাবার নিয়ে আসত আমার স্ত্রীর ঘরে। ওখানে ও শুয়ে শুয়ে আর আমি বসে প্রাতরাশ সেরে নিতাম। তারপর আমি চলে আসতাম আমার পড়ার ঘরে আর দুপুর পর্যন্ত কাজ করতাম, অন্তত কাজ করার চেষ্টা করতাম। ওদিকে বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকার পর আমার স্ত্রী যেত প্রসাধনের জন্য। দীর্ঘ সময় লাগত ওর খুঁটিনাটি প্রসাধনের কাজে আর ওই কাজের মাঝখান থেকেই ডাক পেড়ে দুপুরের খাবার কী হবে তার ফরমাশ করত। প্রায় দুপুর হয়ে এলে নীচে নেমে আসতাম আর স্ত্রীর কাছে এসে বসতাম। এখানে সামনের পার্ক পর্যন্ত নজর পড়ে এমন একটা খোলা জানালার সামনে বসে আমরা দুপুরের খাবার খেতাম। এরপর কফি পান করার জন্য চলে যেতাম বাদাম গাছের ছায়ায়। তারপর শুরু হত যে যার ঘরে একটু বিশ্রাম নেবার পালা। নীচের বৈঠকখানায় আমরা আবার চা খাবার জন্য মিলিত হতাম। পরে পাক্ খাওয়া রাস্তা ধরে আমরা চলে যেতাম এক খামার বাড়ি থেকে অন্যটার দিকে। কখনও বা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ক্যানেলের তৃণাচ্ছাদিত পাড়ের ওপর বেড়াতাম, আবার কখনও-বা গ্রাম বা শহর পর্যন্ত না গিয়ে বড় রাস্তা ধরে এমনিই এগিয়ে যেতাম কিছুটা। ঘণ্টাখানেক বেড়িয়ে ফেরার পর আমি আমার স্ত্রীকে ইংরেজী পড়াতে বসতাম। সময় হাতে থাকলে ওকে পড়তে বলতাম বা নিজেই কিছু পড়ে শোনাতাম। নৈশভোজের পরও কোনো কোনো দিন পড়াশোনা বা এমনি কথাবার্তা চলত আমাদের। এরপর খুব দেরি না করে আমরা শুতে যেতাম, আমিই যেতাম ওর

শোবার ঘরে। সারাদিন যে উদ্দেশ্যে অতিবাহিত হয়েছে আমাদের, তারই পূর্ণ পরিণতি ঘটত এই সময়টিতে। পরস্পরকে আমরা প্রেম নিবেদন করতাম এ সময়। এই মুহূর্তগুলোতে আমি আমার স্ত্রীকে শান্ত আর সহযোগী দেখেছি। সারাদিনের নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনের পর সেও যেন কিছু পুরস্কার দিতে আর পেতে প্রস্তুত হয়ে থাকত। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে গ্রামের নৈশ রূপটি চোখে পড়ত। তার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হত মাঝে মাঝে দু-একটা রাতজাগা পাখির ডাকে। বৃহৎ শয়নকক্ষের মৃদু আলোকের পটভূমিতে আমাদের প্রেম যেন হঠাৎ প্রজ্বলিত দীপ শিখার মত প্রাণবন্ত হয়ে উঠত, আর দীর্ঘ সময় ধরে আলোক বিচ্ছুরিত হত তা থেকে। ও যেন সেই বিষণ্ণ কক্ষের মধ্যে অনির্বাণ তৈলদীপ, যে এক কালে ওই কক্ষগুলিকে আলোকোজ্জ্বল করে রেখেছিল। মনে হত প্রতিদিন আমার স্ত্রীকে গভীরতর ভাবে ভালবাসছি। প্রতি সন্ধ্যায় সে প্রেম সমৃদ্ধ হচ্ছে আর প্রাণশক্তি সংগ্রহ করছে অতীত সন্ধ্যার প্রেমসঞ্চয় থেকে। ওর দিক থেকেও যেন ক্লান্তিহীন প্রেমসিক্ত আসঙ্গ লিপ্সার অন্ত নেই। দাম্পত্য প্রণয়ের অর্থ বোধহয় ঐ রাতগুলিতেই আমি প্রথম আর শেষ বারের মত উপলব্ধি করেছিলাম। এ যেন বৈধ ভোগবাসনা আর প্রচণ্ড আসক্তির সম্মিলিত রূপ, প্রচণ্ডভাবে প্রাপ্তি আর আত্মতুষ্ট আনন্দের সীমাহীন প্রকাশ। 'আমার বাড়ি' 'আমার পুকুর', 'আমার গাড়ি'র মতই একই ভাবে 'আমার স্ত্রী' বলতে গিয়ে বিবাহিত সম্পর্কের যে নির্বোধ পরিচয় দিয়ে থাকে কেউ কেউ, তার সঠিক কারণটি যেন বুঝলাম এতদিনে।

ও দিকে সুযোগ-সুবিধে যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমার কাজ কিন্তু মোটেই এগোচ্ছিল না। আমার প্রবল ইচ্ছা, বিয়ের একটা ঘটনা নিয়ে বড় একটা গল্প বা একটা ছোট উপন্যাস লিখি। এ হল আসলে আমার আর স্ত্রীর গল্প। এগুলো ছোট ছোট নির্দিষ্ট ঘটনার পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে আমার মনের মধ্যেই ছিল, প্রয়োজন ছিল শুধু

অনায়াসে সেগুলোকে গল্পের মধ্যে গেঁথে নেওয়া। কিন্তু কাগজের সামনে লিখতে বসলেই যেন সব জট পাকিয়ে যেতে লাগল। হয় কতকগুলো কেটে-কুটে দেওয়া হিজিবিজি শব্দে কাগজগুলো ভরে উঠত, নয় তো দু-এক পৃষ্ঠা লেখার পর দেখা যেত অর্থহীন কতকগুলো অস্পষ্ট বাক্যের সমষ্টি গড়ে উঠেছে। এমনও হয়েছে যে দু এক ছত্র লেখার পর খোলা পাতার সামনে নিস্তব্ধ বসে রয়েছি আমি। তখন আমাকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন মনে হলেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় মন আর মস্তিষ্ক নিয়েই আমি বসে থাকতাম। সমালোচনার যোগ্য অনুশীলিত মন ছিল আমার। খবরের কাগজের জন্য কয়েক বছর সমালোচনাও লিখেছিলাম আমি। তাই স্পষ্ট দেখলাম, কাজে আমি যে শুধু এগোচ্ছি না তা নয়, আমার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। আগে যে-কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া বা তা দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কিছু লেখার শক্তি আমার ছিল। কবিতা লেখার চেষ্টা অবশ্যই করি নি তবু রুচিপূর্ণ স্পষ্টতার মান আমার লেখায় দেখা যেত। এখন কিন্তু দেখা গেল যে শুধু বিষয়বস্তুই নয় আমার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনাশৈলীও আমাকে ছলনা করছে। কোনো এক দুর্দৈবশক্তির প্রভাবে আমার লেখার পাতাগুলো যেন অসঙ্গত, অস্পষ্ট ভাঙা-ভাঙা বাক্যের পুনরুক্তিতেই ভরে উঠতে লাগল। ওর মধ্যে কেবল অর্থহীন বিশেষণ, অসঙ্গত অর্থে ব্যবহৃত বাক্‌ধারা আর বহু প্রচলিত গতানুগতিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে যে নিয়মিত আর সুসঙ্গত রচনাশৈলী গদ্যের প্রাণ বা পদ্যের প্রকৃতি, সেই ছন্দেরই অভাব ঘটেছিল আমার মধ্যে। মনে পড়ে, একদিন এই ছন্দ আমার ছিল, যদিও বা তার প্রকৃতি আর পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আজ যেন তাও গেল হারিয়ে আর আমি কেবলই এক বেসুরো বিক্ষোভের কলরবে হোঁচট খেতে লাগলাম।

আমার স্ত্রী যদি লেখার জন্য জিদ না করতেন তবে ও আমি ছেড়েই দিতাম কোন কালে। সুখের দিক থেকে ওর প্রতি

ভালবাসাই ছিল যথেষ্ট। এমন একটি দিনও কাটে নি যে দিন সে সস্নেহ আগ্রহে জানতে চায় নি আমার লেখায় কতটা এগোচ্ছি। কাজ যে একটুও এগোয়'নি একথা স্বীকার করতে লজ্জা পেয়েছি, তাই হেঁয়ালি করেই বলেছি যে বেশ এগোচ্ছে আমার কাজ। লিখিয়ে নেবার দায়িত্ব যে তার একথা বেশ বুঝত সে, আর সেই কারণেই এই লেখার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করত বড্ড বেশি করেই। এ দিকে আমিও প্রতিদিন অনুভব করতাম যে নিজের জন্য যতটা নয় তার অনেক বেশি তারই প্রয়োজনে গল্পটি সমাপ্ত করা দরকার। ওর প্রতি প্রেম আর আমার জীবনে ওর উপস্থিতি যে বিপুল পরিবর্তন এনে দিয়েছে তারই প্রমাণ আমার রাখা দরকার এই কাহিনী রচনায়। ঠিক এই কথাই আমি ওকে আলিঙ্গন করে চুপিচুপি বলতে গিয়েছিলাম, যেদিন বলেছিলাম এর পর থেকে ওই-ই হবে আমার সাহিত্যজীবনের অধিষ্ঠাত্রী। ওর প্রাত্যহিক প্রশ্নই ছিল, সকালটা আমি কি করে কাটাব। ও আমাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে ঠিকই কিন্তু ওর অবস্থা হয়েছে পৌরাণিক মহিলাদের মত যারা তাদের বীরপুরুষদের অনুরোধ করত দৈত্যকে হত্যা করে সোনালী পশমওলা চামড়া এনে দিতে। কিন্তু ভীত, অনুতপ্ত বীরপুরুষ খালি হাতে ফিরে এসেছে, সোনালী পশমওলা চামড়া আনে নি বা ড্রাগনের মুখোমুখি যুদ্ধ করতে সাহস পায় নি এমন কথা কাহিনীতে বর্ণিত হয় নি। ওর জিদটার ধরন ছিল যুক্তিহীন। চিন্তাসাপেক্ষ সৃজনীশক্তির পথে যে নানান বাধা থাকতে পারে এ কথা একজন শিক্ষিতা মহিলা ভাল করেই জানেন। আমার এই সাধারণ বুদ্ধির সরল কর্ত্রীটি কিন্তু ভেবে নিয়েছিল যে ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করলেই কাব্য রচনা করা যায়। প্রাত্যহিক ভ্রমণের এক ফাঁকে আমি একদিন সাহিত্য-সৃষ্টির অন্তরায় বাধাবিপত্তিগুলোর দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। দেখলাম, ও আমার কথা মোটেই বুঝতে পারল না।

আমার কথা শুনে ও বলল, 'দেখ, আমি লেখিকা নই আর তাছাড়া সাহিত্যরচনার কোন আকাঙ্ক্ষাও নেই আমার। তবে একথা ঠিক যে শক্তি আর ইচ্ছা থাকলে বহু কথাই আমি প্রকাশ করতাম। তাছাড়া তুমি যে পরিবেশে এখানে কাজ করছ তাতে বহু কথা সুন্দর করেই তুমি যে বলতে পারবে এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে।' একটু থেমে ও আমাকে আড়চোখে একবার দেখে নিল। তারপর কথায় ভালবাসার সুর ঝরিয়ে দিয়ে ও বলে উঠল, 'মনে নেই, আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে বলে তুমি না কথা দিয়েছ? একথা তোমায় রাখতেই হবে।' কোন উত্তরই আমি দিলাম না, তবে মনে মনে ভেবে নিলাম টেবিলে জমে-ওঠা কাগজের স্তূপটির কথা। ওগুলোর মধ্যে শুধু কাটাকুটি আর এখানে ওখানে দু-এক ছত্র লেখা ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

স্ত্রীর সঙ্গে পুরো বা আংশিক নিশি-যাপনের পর সকালবেলা যখনই লিখতে বসেছি তখনই কিন্তু কিছু না লিখে মনের রাশ আলগা করে দিয়ে শুধু শুধু বসে থাকতেই প্রবল ইচ্ছে হয়েছে আমার। মাথার ভেতরটা তখন কেমন যেন খালি খালি ঠেকত, ঘাড়ের মধ্যে অনুভব করতাম এক ধরনের হাল্কা ভাব, আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোর যেন কোন শক্তিই তখন থাকত না। ভুল হোক আর ঠিক হোক এ কথা ভেবে নিতে আমার বেশি সময় লাগে নি যে আমার আলস্যের আর কাজে মনোনিবেশ করার যে অক্ষমতা তার একমাত্র কারণই হল স্ত্রীর কাছে পূর্বরাত্রে প্রেমনিবেদনের পর দৈহিক আড়ষ্টতা। মাঝে মাঝে কাজ ফেলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম আমি, দেখতাম মুখের পেশীগুলো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে আর দ্যুতিহীন চোখের কোণে কালি জমেছে বেশ ঘন হয়েই। সংক্ষেপে এটুকুই বলা যায়, যে বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি নিয়ে রাত্রিতে স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরেছি পরের দিন ক্লান্ত অবসন্ন দেহের সীমানায় তার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পাই নি। যে শক্তিতে আমি লেখনী ধারণ করতে পারতাম তা

যেন আগের রাতে স্ত্রীর আলিঙ্গনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় লেখার দিকে যেটুকু কম পড়েছে সেটুকু আমি আমার স্ত্রীকে উৎসর্গ করে দিয়েছি। এ কিন্তু আমার মোটামুটি একটা ধারণা মাত্রই নয়; এ হল আমার যথার্থ এক অনুভূতি, সত্যকারের বিশ্বাস বা ধারণা। আমার সৃজনীশক্তি যেন দেহ থেকে প্রতি রাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছিল, আর পরদিন সোজা হয়ে কাজ করতে বা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী রাখতে আমি কিছুতেই পারছিলাম না।

আরও বেশ কয়েকটা দিন রাত্রে প্রেম-নিবেদনের পালা সেরে সকালে স্পষ্টভাবেই বুঝলাম যে কেবলমাত্র ঐ কারণেই কাজ করার শক্তি আমার হারিয়েছে। এ কথা স্বীকার করব যে এই অলস আবিষ্টতা কোনো দিক থেকেই তখনো কোন পরিবর্তন ঘটায়নি,—না স্ত্রীর প্রতি প্রেমের পরিমাণে, না দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে। বাসনার আতিশয্যে প্রেমঘন মুহূর্তে আমি আমার বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে ভাবতাম এভাবে নিশিযাপনের আর প্রভাতে কাজ-করার মত উপযুক্ত শক্তি আমার আছে। সকালে সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থা ফিরে আসত বটে কিন্তু রাত্রি হলেই আবার সেই পূর্বেকার অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটত। এই ক্লান্ত মানসিকবৃত্তে কিছুদিন পাক খাওয়ার পর এক সন্ধ্যায় স্থির করলাম যে এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব। তাছাড়া লেখার জন্য জিদ্‌টা যখন ও তরফেই বেশি তখন ভরসা হল যে আমার যুক্তিগুলো ও মেনে নেবে। পাশে শুয়েছিল আমার স্ত্রী। ওকে বললাম, 'দেখ, তোমাকে একেবারেই বলা হয়নি এমন একটা কথা আজ বলব।'

গরমের রাত। হাত দুটোকে ঘাড়ের নীচে জড় করে বালিশে মাথা রেখে ও শুয়েছিল, আমি ছিলাম ওর পাশেই। একটুও না নড়ে ও উত্তর দিল, 'বল শুনি।'

'তুমি কি আমাকে গল্পটা সত্যিই লিখতে বল?'

'নিশ্চয়ই।'

'সেই গল্পটা, যার মধ্যে তোমার আর আমার কথা থাকবে?'

'তাই তো।'

'কিন্তু এভাবে চললে, লেখা আমার দ্বারা কোনো দিনই সম্ভব হবে না।'

'এভাবে চললে বলতে কী বোঝাতে চাইছ?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, 'প্রতি রাত্রেই ত আমরা একসঙ্গে থাকছি। এভাবে থাকার ফলে লেখার শক্তি আমার কমে যাচ্ছে বলেই ধারণা। এরকম করে চললে কোনো দিনই কিছু লেখা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না বলে মনে হচ্ছে।'

আমাকে বুঝবার চেষ্টায় ও তার বিশাল বিস্ফারিত নীল চোখের দৃষ্টি আমার দিকে মেলে ধরল। তারপর বলে উঠল, 'কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা কী ভাবে কাজ করেন?'

'তা আমি জানি না,—তবে আমার কী মনে হয় জান? লেখার কাজ করার সময় তাঁরা একটু সংযত জীবন যাপন করেন।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছি ডি. এ্যানান্‌সিওর এক দঙ্গল প্রেমিকা ছিল। তাহলে তিনি কাজ করতেন কী করে?'

উত্তরে বললাম, 'ওঁর বহু প্রেমিকা ছিল কি না জানি না, তবে কয়েকটি বিখ্যাত মহিলার সঙ্গে যে মেলামেশা ছিল তা শুনেছি। ওদের কথা অবশ্য সবাই বলত, তবে উনি নিজেই বলতেন সবচেয়ে বেশি করে। মনে হয় একটা কিছু ভাল জীবনযাপন পদ্ধতি তিনি নিশ্চয়ই অনুসরণ করেছিলেন।—আচ্ছা বোদলেয়রের কথাই ভাব, তাঁর সংযমী জীবনের কথাতো সবাই জানে।'

ও চুপ করে রইল। আমার মনে হল আমার যুক্তিগুলো হাস্যকর সমাপ্তিতে এসে পড়েছে। কিন্তু শুরু করেছি যখন, একটা সিদ্ধান্তে আমাকে পৌঁছতেই হবে। একটু আদরের সুরে শান্তভাবেই আবার বললাম, 'দেখ, সত্যি বলতে কি আমি এ গল্পটি লিখতে বা রাতারাতি

সাহিত্যিক হয়ে উঠতে মোটেই চাই না। এসব কাজ আমি অনায়াসেই বন্ধ করতে পারি ; আমার কাছে সবচেয়ে দামী জিনিস হল আমাদের প্রেম।'

যেন ভ্রূকুটি করেই ও বলল, 'কিন্তু আমি চাই তুমি ওটা লেখ আর সাহিত্যিক হয়ে ওঠ।'

'কেন ?'

একটু যেন বিরক্ত হয়েই ও উত্তর দিল, 'কারণ তোমার লেখবার ক্ষমতা আছে, আর আমি বেশ বুঝতে পারছি তোমার লেখার মত অনেক জিনিসই রয়েছে। তাছাড়া অপরে যে ভাবে কাজ করে সে ভাবে তোমারও কাজ করে যাওয়া উচিত। আমার ওপর ভালবাসা জানিয়ে তুমি খুশি থাক আর অলসভাবে জীবনটাকে কাটিয়ে দাও, এ আমি ভাবতেই পারি না। তোমাকে বড় হতেই হবে।'

'সাহিত্যিক হবার কোনো প্রয়োজনই নেই আমার,' বললাম কথাটা, কিন্তু নিজের কানেই ওটা আংশিক মিথ্যাভাষণের মত শোনালো। বললাম, 'আমি কিছু না করেও বেশ থাকতে পারি। আগের মত অপরের লেখা পড়ে আনন্দ পেয়ে আর তোমাকে ভালবেসে বেশ সময় কাটাতে পারি। আর যদি আলস্য ত্যাগ করতে হয়ই তবে অন্য যে-কোনো পেশা আমি গ্রহণ করতে পারি।'

আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ও সারা দেহ আন্দোলিত করে উত্তর দিল, 'না, না, তা হতেই পারে না। লিখতেই হবে তোমাকে, অবশ্যই তুমি একজন সাহিত্যিক হবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও আবার বলল, 'আর যদি তোমার কথাই সত্যি হয় তবে আমাদের সব কিছুরই পরিবর্তন করতে হবে।'

'তার মানে ?'

'তোমার গল্প লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রেম-নিবেদনের পালা বন্ধ থাকবে। ওটা শেষ হলেই আমরা আবার শুরু করব।'

প্রস্তাবটা একটু হাস্যকর আর অদ্ভুত হলেও এটিকে এক্ষুণি গ্রহণ করার লোভ যে আমার হয়েছিল একথা অস্বীকার করব না। আচ্ছন্ন ভাব তখনও আমার ছিল তাই অনুমান করতে পারি নি এর পেছনে স্বার্থপরতা আর মিথ্যাচার কতটা ছিল। আবেগের প্রথম উচ্ছ্বাস আমি দমন করলাম। ওকে আমি আলিঙ্গন করে বলে উঠলাম, 'তুমি যে আমায় কত ভালবাস এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছুই নেই লীডা। যা বলেছ তাইই যথেষ্ট। আমাদের এই প্রেমই অক্ষয় হোক, অন্য কিছু ভাববার কোনো প্রয়োজনই নেই আমাদের।'

আমায় একটু সরিয়ে দিয়ে ও প্রায় আদেশের সুরেই বলল, 'না, এ আমাদের করতেই হবে। আর তাছাড়া এই রকমই তুমি বলেছিলে।'

'রাগ করলে লীডা ?'

'না সিলভিও, আমি রাগ করব কেন ? সত্যিই আমি চাই তুমি ওই গল্পটা লেখ। দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মীটি !'—ওর বক্তব্যটিকে গুরুত্ব দেবার জন্যই বোধহয় কথাগুলো বলতে গিয়ে ও দু'হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল।

আমরা আরও কিছুক্ষণ এইভাবে কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। আমি আমার পক্ষ সমর্থন করে চললাম আর ও অনমনীয় মনোভাব দেখিয়ে কর্তৃত্বের সুরে ওর জিদ বজায় রাখল। শেষে বললাম, 'বেশ, তাই হবে। চেষ্টা আমি করব, তবে এমনও তো হতে পারে যে এসবই মিথ্যে, আমি সাহিত্যিক প্রতিভাবর্ণিত একজন অতি সাধারণ মানুষ মাত্র।'

'না সিলভিও, এ কথাটা যে সত্যি নয় তা তুমিও জান।'

'ঠিক আছে, তবে মনে রেখো এই কাজটা তুমিই আমাকে দিয়ে করাতে চাইছ।'

'নিশ্চয় মনে থাকবে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটানোর পর তাকে আলিঙ্গনে বাঁধবার

ইচ্ছায় যেই আমি একটু নড়েছি, ও আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'না, না, আজ এই রাত থেকেই আমরা অন্য ধরনের জীবনযাপন করব।' কথাটা একটু রূঢ় হয়ে গেল ভেবে ও যেন আবহাওয়াটাকে হাল্কা করে তোলবার চেষ্টা করল। একটু হেসে ওর পাতলা লম্বা হাতের মধ্যে আমার মুখটিকে এমন সাবধানে তুলে ধরল যাতে মনে হল কেউ যেন একটা মূল্যবান আধার তুলে ধরছে। বলল, 'কেমন? খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস তুমি এবার লিখবে, তাই না?' এবার আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ও হঠাৎ অদ্ভুতভাবে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমায় ভালবাস?'

একটু অভিভূত হয়েই বললাম, 'এ কথা আমায় জিজ্ঞেস কোরোনা লীডা।'

'পুরো গল্পটি যেদিন তুমি আমায় পড়ে শোনাবে, ঠিক সেদিনই তুমি আমায় ফিরে পাবে। মনে রেখ কিন্তু।'

'আর যদি আমি মোটে লিখতেই না পারি?'

'পারতেই হবে তোমাকে।'

ওর এই কর্তৃত্বের মধ্যে অনভিজ্ঞতার সারল্য মেশানো থাকলেও তা ছিল নিতান্তই অনমনীয় আর এইজন্যই ওর এই মনোভাব আমার বড় ভাল লাগত। প্রাচীন কাহিনীর বীরপুরুষের কথা আবার মনে পড়ল আমার। ওর প্রেমিকা চাইছে ড্রাগনকে হত্যা করে ওর জন্য বীরপুরুষটি সোনালী পশম এনে দিক। এবার কিন্তু আমার আর রাগ হল না বরং একটু প্রশংসাই করতে ইচ্ছে হল বীরপুরুষটির। ওর প্রেমিকার যেমন ড্রাগন আর তার সোনালী পশম সম্বন্ধে ছিল না কোন ধারণা, এরও তেমনি কোন ধারণাই নেই লেখা সম্বন্ধে। আর এই অজ্ঞতার জন্যই ওর দিক থেকে আদেশটি এত ভাল লেগেছিল আমার। এ যেন দেবদত্ত অলৌকিক এক সৃজনীশক্তিকে স্বীকৃতি দান। আমার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আশা আর কৃতজ্ঞতার এক মহিমান্বিত সমন্বয় মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াল। গভীর আবেগে

ওকে চুম্বন করে বললাম, 'পারতেই হবে বৈকি, তোমার প্রতি আমার প্রেমের পরীক্ষা দেবার জন্যই আমাকে সাহিত্যিক হয়ে উঠতে হবে, আমার নিজের প্রয়োজনে নয়।' ও নীরবে শুয়ে রইল, বিছানা থেকে নেমে আমি আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম।

সাহসে ভর করে নতুন উদ্যমে আমি আবার কাজ শুরু করলাম। ভালবাসা আর কাজের মধ্যে সম্পর্ক থাক আর নাই থাক, আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যা নয় এটুকু অনুভব করতে দেরি হল না। বেশ বুঝলাম, এ সিদ্ধান্ত না নিলে আগের সেই শক্তিহীন আচ্ছন্নতাকে দূর করতে আমি কিছুতেই পারতাম না। এর পর প্রতিদিন সকালে যেন নিজেকে আমি অধিকতর শক্তিশালী মনে করতে লাগলাম। মনে হল, আমি সৃজনীশক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠছি। দেখা গেল যে আমার জীবনের একটি মহৎ কামনা ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়ে উঠছে। লেখাও তাহলে কৃপা করল আমাকে। প্রেরণার প্রবল প্রবাহে আমি রোজ প্রায় দশ-বারো পৃষ্ঠা করে লিখে চললাম। লেখার বাইরে দিনের বাকী অংশটুকু কেমন যেন হতবুদ্ধি আর হতচেতনার ভেতর কাটত। মনে হত, এই লেখার কাজের বাইরে কোন কিছুই আর আমার কাছে মূল্যবান নয় এমনকি স্ত্রীর প্রতি প্রেমও নয়। সকালবেলাকার উদ্দীপ্ত সাহিত্যকর্মের পর বাকী দিনটুকু তার অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্টাংশ বলেই মনে হতে লাগল ; নির্বাসিত উজ্জ্বল অগ্নিশিখার শেষে যেমন পড়ে থাকা খানিকটা পোড়া কয়লা আর ছাই। পরের দিন সকালে কাজ শুরু করার পূর্ব পর্যন্ত নিজেকে কেবলই অনাসক্ত, অসুস্থ আর অকর্মণ্য মনে হত। মনের এই ছন্দ বজায় থাকলে বেশ দ্রুতই যে কাজটা শেষ হবে তাতে আর সন্দেহ রইল না। আমার, কেন জানি না, এই কথাই শুধু মনে হতে লাগল যে সব ভুলে গিয়ে আশাতীত এই সোনার ফসলের শেষ দানাটিকেও কুড়িয়ে নিতে হবে আমাকে। আমি সুখী হয়ে উঠেছিলাম। জীবনে আমি বোধ হয় এই প্রথম এমন এক বহির্জগতে গিয়ে

পড়েছিলাম যার নিখুঁত স্বাধীন পরিবেশে আমি পেয়েছিলাম এক পরম নিশ্চয়তার আস্বাদ। এই নতুন জগতে এসে আমি যেন স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে উঠলাম ধীরে ধীরে। মনে হল, হঠাৎ যদি আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে কাজে বাধা পড়ল ভেবেই যতটুকু উদ্বিগ্ন হবার তাই হব, এর বেশী নয়। আমার লেখার সঙ্গে সম্পর্কহীন সবকিছুর সঙ্গে সেও যেন কোনো এক বিচ্ছিন্ন সুদূর অঞ্চলে নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। হাজারবার আত্মপ্রকাশের যে ব্যর্থ চেষ্টা আমি করেছি, আজ সেই ক্ষেত্রেই আমি যে সম্পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছি তাতে সন্দেহ রইল না। আমার যে সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা আছে আর আমি যে একটি মহৎ শিল্পসৃষ্টিতে মগ্ন হয়ে গেছি, এ চিন্তা আমার মনকে অধিকার করে রইল।

ছয়

সারা সকাল কাজ করার পর স্বাভাবিকভাবেই বিকেলটি কাটাতাম। যাতে কোনোরকম মনোবেদনা, আকস্মিক আবেগ বা বিক্ষিপ্ততা মানসিক চাঞ্চল্য না ঘটায় এ বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট সাবধান থাকতাম। বাইরে আমাকে তখন সাহিত্যজগত থেকে বিছিন্ন মনে হলেও অন্তর্জগতে কিন্তু সকালের রচনা আর আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে চলত গভীর আলোড়ন। রাতে তু'জনের শোবার ঘরের মাঝপথে দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতাম, তারপর সোজা চলে যেতাম নিজের বিছানায়। আগামী দিনের নতুন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন আমার তুচোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসত। রাতে অবিরাম বর্ষণের ফলে প্রান্তরে যেমন নতুন তৃণ জেগে ওঠে, ঠিক তেমনি নিদ্রার শেষে আমার দেহমন কর্মক্ষমতা আর চিন্তাশক্তির প্রাচুর্যে ভরে উঠত। আমি নতুন উদ্যমে কাজে বসতাম আর অল্প একটু ইতস্ততঃ করার পর কাজ শুরু করতাম। কোনো এক প্রবলশক্তির প্রভাবেই যেন আমার কলম দৌড়ে চলত কাগজের ওপর দিয়ে, এক শব্দ থেকে আর একটিতে, এক পংক্তি থেকে অন্যটিতে। মনে হত আমার মাথার মধ্যে অফুরন্ত সুতো জড়ানো একটা বিরাট লাটাই আছে। ঐ সুতো টেনে পাক খুলে তাকে সুন্দর কাল কাল অক্ষরের ছাঁদে কাগজের ওপর সাজিয়ে যাওয়াই আমার কাজ। গ্রন্থিহীন সেই সুতোকে মাথা থেকে টেনে বার করে আনতে গিয়ে দেখেছি আমার টানারও যেমন শেষ নেই, সেই সুতোরও তেমনি শেষ নেই। ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রায় দশ-বারো পৃষ্ঠা একটানা আমি লিখে যেতাম। এর পেছনে একটা আশঙ্কাও ছিল। মনে হত হয়তো বা কোনো মুহূর্তে কোনো রহস্যময় কারণে আমার এই

কর্মক্ষমতার প্রবল স্রোত স্তব্ধ হয়ে যাবে বা একেবারেই শুকিয়ে যাবে। লেখার ক্ষমতা যখন আর মোটেই থাকত না তখনই উঠে দাঁড়াতাম। তখন মাথা ঝিমঝিম করত আর টলত আমার পাগুলো। আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে একবার দেখে নিতে দাঁড়াতাম। ওখানে নিজের একাধিক প্রতিবিম্বকে একটার ওপর আর একটা আড়াআড়িভাবে প্রতিফলিত হতে দেখতাম। এরপর প্রায় সারাটা দিনই আচ্ছন্ন আর বিভ্রান্ত হয়ে থাকতাম। বেশ খানিকটা প্রসাধনের পর একটু স্বাভাবিকতা ফিরে আসত।

এরপর ভোজনের পালা। টেবিলে বসে প্রবল ক্ষুধায় গোগ্রাসে গিলতে শুরু করতাম। মনে হত আমি যেন যন্ত্রবিশেষ, যাকে কয়েক ঘণ্টা ভীষণভাবে চালানোর পর তার মধ্যে জ্বালানি ভরে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। খাওয়ার সময় হাসিঠাট্টা, তামাসা এমনকি কথায় কথায় কৌতুকও করতাম আমি। এমনিতে কিন্তু মেজাজটা আমার কিছু পরিমাণে ভারিক্কি। আমার স্বভাবই হল এইরকম। কোনো কারণে আমি যখন কোনো বিষয়ের ওপর বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি তখন আমার প্রায়ই বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যায়; এমনকি উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে শালীনতার সীমাও ছাড়িয়ে চলে যাই। এ ত্রুটির কথা আমার অজানা নেই, একসময় এ নিয়ে আমি লজ্জিত হতাম। কিন্তু আজ আমি যে এই ধরনের ব্যবহার করতে পারছি তার জন্য যেন আনন্দই বোধ করতে লাগলাম। টেবিলে আমার স্ত্রীর মুখোমুখি আমি খেতে বসলেও, অনেক সময় প্রায়ই আমি অনুপস্থিত থাকতাম। আমার মন আসলে পড়ে থাকত ওপরের পড়ার ঘরে। যাই হোক দিনগুলো আমার পানোন্মত্ত ব্যক্তির মত প্রাণোচ্ছলতায় কেটে যেতে লাগল।

কাজে আমি এত বেশী মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে ঐ সময়ের একটি ছোট্ট অথচ মজার ঘটনার দিকে বড় বেশী নজর আমি দিই নি। আমার দেহচর্মের স্পর্শকাতরতা বড় বেশী তাই দাড়িকামানো ব্যাপারটা

চিরকালই আমার কাছে বিশেষ একটা কষ্টের ব্যাপার। কামানোর পর প্রায়ই আমার মুখ জ্বালা করে, মুখে ফুস্‌কুড়ি বেরোয় তাই নাপিতের সাহায্য না নিয়ে আমি নিজে কখনো কামাই নে। অন্যান্য জায়গার মত শহরতলির এই বাড়িতে এসেও সকালে কামানোর জন্য আমি একজন নাপিত ঠিক করে নিয়েছি। ওপাশের গাঁয়ে সে একমেবাদ্বিতীয়ম্ নাপিত। সেখান থেকেই তার ছোট্ট দোকান বেলা বারোটায় বন্ধ করে ঠিক সাড়ে বারোটায় তার সাইকেল নিয়ে এসে পড়ত, ওর আসার সময়ের সঙ্গে আমি আমার লেখার কাজ বন্ধের সময়কে এক করে নিয়েছিলাম।

এই নাপিতটি ছিল বেঁটেখাটো মানুষ। চওড়া কাঁধ, মাথা-ভরা টাক, বেশ মোটা গলা আর গোলগাল মুখ। ঠিক থলথলে চর্বিবহুল তাকে বলা যায় না, বরং আঁটোসাটো ধরনের চেহারা ছিল ওর। ঈষৎ হলদে আর বাদামী রঙের মুখ দেখে মনে হত ও যেন সবে রক্তহীনতা থেকে সেরে উঠছে। দেখবার মত ছিল ওর চোখগুলো। বড় বড় গোল চোখ দুটোর মধ্যে সাদা অংশটা যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ওর মধ্যে বিস্ময়, প্রশ্ন আর যেন কিছুটা বিদ্রূপ মিশে গিয়েছিল। নাকটা ছিল ওর খুব ছোট। বড় মুখখানায় হাসি দেখাই যেত না প্রায়, কিন্তু হাসলে ওর ঠোঁটহীন মুখের ভেতর থেকে দু'-পাটি নোংরা ভাঙা দাঁত বেরিয়ে পড়ত। ওর চিবুকে একটা অসম্ভব ধরনের বিরক্তিকর টোল পড়ত। আকারে ওটা প্রায় একটা নাভির মত, ওর নাম ছিল এণ্টোনিও। গলার স্বরটি ছিল অস্বাভাবিক ধরনের শান্ত আর কোমল। প্রথম দিনটি থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে ওর হাতে অসাধারণ দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতা রয়েছে। ওর বয়স চল্লিশের কোঠায়। স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার। ওর সম্বন্ধে শেষ খবর, ওর বাড়ি আসলে টাশক্যানীতে নয়। সিসিলিতে দেশ; ওখানকারই এক গ্রামে ওর জন্ম। ও যখন সেনাবিভাগে কাজ করত তখনই এক প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে বিয়ে করে শেষ পর্যন্ত এখানেই

সে ঘর বাঁধে। শেষে এখানেই ও দাড়িকামানোর দোকান একটা খোলে। ওর স্ত্রী একটা খামারে কাজ করত। ছুটির আগের দিন কামানোর দোকানে খদ্দেরের ভীড় জমে যায় তাই শনিবার হলেই ওর স্ত্রী দোকানে গিয়ে ওকে সাহায্য করত। ·

এন্টোনিও খুব সময়নিষ্ঠ ছিল। প্রতিদিন ঠিক সাড়ে বারোটায় সামনের খোলা জানালার তলায় কাঁকর-বাধানো রাস্তার ওপর সাইকেল চলার একটা বিশেষ ধরনের শব্দ শুনতে পেতাম। ওই শব্দ থেকেই বুঝতাম, কাজ বন্ধ করার সময় হয়েছে। একটু পরেই ও এসে দরজায় শব্দ করত আর আমিও পড়ার টেবিল থেকে উঠে ওকে ভিতরে আসতে বলতাম। এরপর ও ঘরে ঢুকে, নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করত আর ঈষৎ নুয়ে আমায় অভিবাদন জানাতো। ওর ঢোকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক মগ গরমজল নিয়ে পরিচারিকাটি ঘরে আসত আর যে চাকা-লাগানো টেবিলে সাবান, বুরুশ আর ক্ষুর রাখা হত তারই ওপর ওটা রাখত। ইতিমধ্যে আমি একটা আরাম চেয়ার দখল করে নিতাম, আর এন্টোনিও ঐ টেবিলটি ঠেলে আমার কাছে নিয়ে আসত। আমার দিকে পেছন ফিরে ও তার ক্ষুরে বেশ কিছুক্ষণ শান দিয়ে নিয়ে একটা পাত্রে গরমজল ঢেলে বুরুশে অনেকক্ষণ ধরে সাবান মাখিয়ে নিত। ফেনাভর্তি বুরুশটা মশালের মত শূন্যে উঁচিয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াত। এরপর যতক্ষণ না আমার মুখের নীচের অংশটা সাবানের সাদা ফেনায় ভরে ওঠে ততক্ষণ ও সাবান মাখিয়ে চলত। তারপর বুরুশ রেখে ক্ষুরে হাত দিত।

এন্টোনিও কত মন্থরগতিতে অথচ নিখুঁতভাবে কাজ করত আর আমি তা উপভোগ করবার জন্য কী ভাবে প্রস্তুত হয়ে উঠতাম শুধু সেইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যই এই সাধারণ জিনিসগুলোর এত খুঁটিনাটি বর্ণনা করলাম। কামানোর ব্যাপারটা আমার কাছে কোনো দিনই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। কোনো কোনো অপদার্থ নাপিতের অকারণ হৈ চৈ আমাকে আরও বেশী করে বিব্রত করে তোলে।

এন্টোনিওর ব্যাপারটি কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক। ওর এসে পৌঁছানর আগে লেখার টেবিলে যে সময়টুকু আমি কাটাতাম সেইটুকুই যে মূল্যবান, সে ধারণাই আমার প্রবল হয়েছিল। পরের সময়টুকু কামানোতে, বই পড়ায় বা স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় কাটল কি-না তাতে আমার কিছু যেত আসত না। আমার কাজের বাইরের সময় নিয়ে আমি কক্ষনো মাথা ঘামাই নি কারণ ওর সঙ্গে আমার কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না।

এন্টোনিও বেশী কথা বলত না। আমি কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে শ্রম আর সংযমের সঙ্গে কাজ করার পর আমার আনন্দ প্রকাশের পথ খুঁজে বেড়াতাম। আমি তাই যা খুশি তা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতাম ; কখনো গ্রামের জীবনযাত্রা নিয়ে, কখনো-বা গ্রামবাসী, ফসল, তার পরিবার, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বা এমনি যে কোনো কিছু বিষয় নিয়ে। সবচেয়ে যে আলোচনায় আমি বেশী আনন্দ পেতাম, বেশ মনে আছে, তা হল নাপিতটির দক্ষিণ দেশের জন্মভূমি আর এই কর্মভূমির মধ্যে পার্থক্য। টাশক্যানী আর সিসিলির মধ্যে পার্থক্য বিরাট। একাধিকবার এই আলোচনাপ্রসঙ্গে ওর কাছ থেকে টাশক্যানী সম্পর্কে মজার মন্তব্য শুনেছি। ওর কথায় টাশক্যানদের সম্পর্কে বিরক্তি আর ঘৃণার ঝাঁঝ মেশানো থাকত। এন্টোনিও খুব খাঁটি কথা বলত তবে তার মন্তব্যের ধরন ছিল সর্বদাই পরিমিত। ওর কথা বলার ধরনটাই ছিল সংযত, সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ। এগুলোর সঙ্গে স্বল্পপরিমাণ বিদ্রূপও মিশে থাকত। আমি হয়তো হাসিতে ফেটে পড়েছি বা কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছি এমন সময় ও সাবান লাগানো বা কামানো বন্ধ করে আবার শান্ত হয়ে না আসা পর্যন্ত বুরুশ বা ক্ষুর শূন্যে তুলে ধরে চুপ করে অপেক্ষা করত।

সাত

আমি আগেই পরিষ্কার করে বলেছি যে এণ্টোনিওর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পেছনে আমার কোনো উদ্দেশ্যই থাকত না। কিন্তু কিছুদিনের পর বুঝলাম ওর মনের গভীরতায় প্রবেশ করতে পারি নি বা ওর মনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই ধারণা হয় নি আমার। গরীব আর বেশ বড় রকমের সংসার ওর, তবু টাকার জন্য ওর ভাবনা ছিল না বলেই আমার ধারণা। লোকে নিতান্ত স্বাভাবিক আর অনিবার্য ঘটনা নিয়ে যেভাবে কথা বলে, ও তার সংসারের কথায় তেমনি নিরাসক্ত ভাবে, স্নেহ বা নিষ্ঠুরতার কোনো রকম ভাব না দেখিয়েই কথা বলত। রাজনীতিতে ওর কোনো আগ্রহ ছিল না। নিজের কাজ সে ভালই জানত তবু ওটা ওর কাছে নিতান্ত একটা জীবিকা অর্জনের পথই মাত্র ছিল। যাঁরা ধনী তাঁদের একটা ধারণা দরিদ্রেরা নিশ্চয়ই অনেক বেশী চিন্তা ভাবনায় দিনাতিপাত করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে ওরা সকলের মত একই স্তরে রয়েছে। তবু এণ্টোনিওর সম্বন্ধে কিছু রহস্য আছে বলেই আমার যেন ধারণা।

কামানোর সময় আমার স্ত্রী জানালার কাছে রোদে হয় একটা বই নয় তো নখ কাটা আর পালিশের জিনিসপত্র নিয়ে বসত। কেন জানিনা, এণ্টোনিও যখন কামাচ্ছিল তখন আমার স্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে মনটা আনন্দে ভরে গেল। ঠিক এণ্টোনিওতে যেমনি ওর মধ্যেও তেমনি আমার আনন্দ-স্বরূপটিকে প্রতিবিম্বিত দেখলাম আমি। একটু অন্যরকমে হলেও, ও এমনি করে ঘরে এসে আমার দৈনন্দিন জীবনের কাজে অনেক সাহায্য করত। এতে আমি অতি সহজে আমার শান্ত সুন্দর আর সুশৃঙ্খল মানসিকতাটি ফিরে পেতাম

আর পেতাম কাজ করার জন্য অপরিমিত উৎসাহ। নাপিতের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লীডাকেও বইটা কেমন লাগছে, শরীর কেমন আছে বা কী কাজ এখন সে করছে এমনি সব প্রশ্ন করতাম। নখ পরিষ্কার করতে করতে বা বই পড়তে পড়তেই চোখ না তুলে কথার উত্তর দিয়ে যেত ও। ওর ঘাড়ের দু দিকে ঝুলেপড়া সুন্দর চুলের গোছায় বাইরের আলো এসে পড়ত। নোয়ানো ঘাড়ের পাশ দিয়ে আমার দৃষ্টি বাইরে চলে যেত জানালার ভেতর দিয়ে। ওখানে আলো-কোজ্জ্বল গাছপালা আর নীল আকাশের টুকরো ছবি আমার চোখে এসে পড়ত। সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে এসে পুরোনো আসবাব-পত্রগুলোয় সৃষ্টি করত তামাটে প্রতিফলন আর মাঝে মাঝে এণ্টোনিওর ক্ষুরটিও এমন চকচক করে উঠত যাতে সহসা ঝলসে যেত আমার চোখ। জানালার চৌকাঠ থেকে শুরু করে ঐ আলো ঘরের আনাচে কানাচে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ত যাতে মনে হত যে ঘরের ময়লা দূর হয়ে গেছে আর রঙ চটা আসবাবগুলোও যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এমনি এক সকালে আনন্দের পূর্ণতার মাঝখানে মনে মনে ভেবে নিলাম, 'আমি আরাম চেয়ারে শুয়ে রয়েছি, এণ্টোনিও আমাকে কামাচ্ছে আর অজস্র আলোর মাঝখানে ঠিক জানালার তলায় বসে আছে আমার স্ত্রী, এ দৃশ্যটি আমি আজীবন স্মরণ করব।'

ড্রেসিং গাউন পরে আমার স্ত্রী একদিন এল আমার ঘরে। এণ্টোনিওকে ডেকে বলল, ওর চুলের ওপর একটু ঢেউ খেলানো লোহাটি বুলিয়ে নেওয়া দরকার বোধ করছে ও। ইতিমধ্যে ও তার চুল ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছিল। এণ্টোনিও যখন বললে যে চুলের কাজ ও জানে তখন আমাকে কামানোর পর ওর ঘরে ওকে যেতে বলে আমার স্ত্রী চলে গেল। মেয়েদের চুলের কাজ ও ভাল জানে কিনা আবার ওকে জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে কোনো রকম আড়ম্বর না করেই ও জানাল যে এ অঞ্চলের সব মেয়েই চুল ঠিক করে নিতে ওর কাছেই যায়। একেবারে গেঁয়ো চাষীদের মেয়েরাও যে

'কোঁকড়ানো চুল স্থায়ী ভাবে রেখে দিতে পছন্দ করছে আজকাল. জেনে বড় বিস্মিত হলাম। একটু হেসে ও বললে,, "বিশ্বাস করুন, শহুরে মেয়েদের চেয়ে এ ব্যাপারে এরা বড় বেশী সাবধান। ওদের সন্তুষ্ট করা বড় শক্ত, ওরা ত পাগল করে ছাড়ে।' আমাকে কামানো সেরে ও তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার স্ত্রীর ঘরে চলে গেল।

ও চলে গেলে আমার স্ত্রী যে চেয়ারে বসে বই পড়ছিল, সেখানে গিয়ে বসলাম। বুঝলাম ও টাসোর 'এ্যামিনটা' বইখানাই পড়ছিল। ওটা বেশ কয়েকবার পড়া হয়ে গিয়েছিল আমার। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ওই কবিতার মহৎ মাধুর্যের সঙ্গে আজকের এই দীপ্তিমান সুন্দর প্রকৃতির আন্তরিক একাত্মতা রয়েছে। আমার মন এক স্পর্শ-কাতর সরলতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভুলেই গেলাম যে আমি আমার স্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছি। যতবার জানালার বাইরে তাকাই ততবারই যেন অপূর্ব সুরমাধুর্যে আমার মন আবিষ্ট হয়ে যায়। উষ্ণ শয্যার সুখপ্রদ আরামটুকু জাগ্রত অবস্থায় যেমন করে কেউ কেউ উপভোগ করে তেমনি সচেতন অবস্থায় আমি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে লাগলাম। স্ত্রার কাজ শেষ করতে এণ্টোনিওর লাগল প্রায় একঘণ্টা। পরিচারিকাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ও যখন চলে গেল, কাঁকর-বাঁধানো রাস্তায় ওর সাইকেলের সেই বিশেষ শব্দটি আমি বেশ শুনতে পেলাম। এর কয়েক মিনিট পরেই আমার স্ত্রী ঘরে এল।

দেখলাম এণ্টোনিও ওর মসৃণ অবিন্যস্ত চুলগুলোকে একেবারে বদলে দিয়েছে। মাথাভর্তি ঢেউ-খেলানো চুলে আঠারো শতকের পরচুলার ভাব এসেছে যেন। ওর পাতলা লম্বাটে গড়নের মুখের সঙ্গে ঢেউ খেলানো চুলগুলো বড্ড বেমানান লাগল প্রথমেই। ও যেন চাষীদের বাড়ির হালফ্যাসানের পোষাক-পরা মেয়ে, এমনি মনে হল আমার। লাল জিরেনিয়াম ফুলের একটি তাজা গুচ্ছও

তার কপালের একপাশে গুঁজে নিয়েছিল। এতে কিন্তু গ্রাম্যভাবটাই যেন বেশী করে ফুটে উঠেছিল।

আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'অপূর্ব! এণ্টোনিও দেখছি যাদু জানে। রোমের মারিও, এ্যান্তিলিও এবার চুলোয় যাক। ওরা তো এণ্টোনিওর জুতোর ফিতেও বাঁধবার যোগ্য নয়। এখানকার মেয়েরা রোববারের মেলায় যাবার সময় যেমন সাজে, তোমাকে অবিকল তেমনি দেখতে লাগছে। আর ফুলগুলোও যা সুন্দর, কী বলব! দাঁড়াও তো, একটু ভাল করে দেখি।' নাপিতের কাজটি কত সুন্দর হয়েছে তা দেখার জন্য উঠে দাঁড়ালাম আমি।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, হঠাৎ কেন জানি না স্ত্রীর মুখখানা থমথমে হয়ে এল। রাগলে যেমন করে ওর নীচের ঠোঁটটি কাঁপে, ঠিক তেমনি থরথর করে কেঁপে উঠল ওর ঠোঁট। শেষে বিরক্তির তীব্রতায় ও আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তামাশা কোরো না বলছি, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

কিছু না বুঝেই বললাম, 'লজ্জা কি? তোমাকে সত্যিই সুন্দর মানিয়েছে। আমি বলছি, এণ্টোনিও অদ্ভুত কাজ করেছে। এবার যদি রোববারের মেলায় যাও, সবাই তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। নাচতে গেলে কিন্তু নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব আসার সম্ভাবনাও আছে।'

মনে হল ওর খেয়ালী মন এণ্টোনিওর কাজে খুশি হয় নি। কেশবিন্যাসের পেশায় যারা আনাড়ি তাদের কাজে একটু চটে যাওয়া বিচিত্র নয়। ও ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠল, 'আমি কি তোমায় বলিনি যে ঠাট্টা কোরো না?'

হঠাৎ মনে হল কেশবিন্যাসে নয়, অন্য কিছুতে ও ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার বলত?' ও তখন বাইরের দিকে তাকিয়ে জানালার চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ পেছন ফিরে ও বলল, 'ব্যাপারটা এই যে কাল থেকে ওই

নাপিতটিকে বদলে নিয়ে তুমি আমাকে একটু দয়া দেখাবে। এণ্টোনিওকে আমি আর এখানে দেখতে চাইনে।'

বিস্মিত হয়ে জবাব দিলাম, 'আমি বেশ জানি যে ও শহুরে নাপিত নয়। কিন্তু আমার কাজ তো ও বেশ ভালই করে! তাছাড়া ওর সাহায্য তোমার ত আর দরকার হবে না।'

রাগে ফেটে পড়ল লীডা। গলা চড়িয়ে বলে উঠল, 'তুমি কেন আমার কথা বুঝতে পারছ না সিলভিও। কাজ কেমন করে, সে প্রশ্ন আমি মোটেই তুলি নি।'

'তবে ব্যাপারটা কী?'

'ও আমার অসম্মান করেছে। ওর মুখ আমি দেখতে চাইনে।'

'তোমার অসম্মান করেছে?' আমার কথায় আর গলার স্বরে সকাল বেলাকার উদাসীন নিশ্চিন্ততার স্পর্শ ছিল হয় তো বা। ও যেন বিদ্রূপের সুরেই বলে উঠল, 'এণ্টোনিও আমায় অসম্মান করেছে এতে তোমার কী! সত্যিই তো তোমার কিছু হয় নি।'

মনে হল, ওর মনে আঘাত দিয়েছি আমি। ওর কাছে গিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গেই বললাম, 'আমি ঠিক তোমার কথা বুঝতে পারিনি লীডা, আমায় তুমি মাফ কর। কিন্তু সে তোমায় কী ভাবে অসম্মান করেছে তা আমায় একটু পরিষ্কার করে বল।'

ও আবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। রাগে ওর নাসারন্ধ্র তখন বিস্ফারিত আর চোখের মধ্যে কঠিন মনোভাবের ছায়া। বলল, 'আমি বলছি, ও অসম্মান করেছে আমার। এর বেশী কিছু আমি বলতে চাই নে। ও মারাত্মক লোক, ওকে এখানে আমি যেন আর না দেখি। ওকে দূর করে দাও, অন্য যে কোনো একজনকে নিযুক্ত কর ওর জায়গায়।'

'বেশ শ্রদ্ধাশীল বলেই তো মনে হয় ওকে। তাছাড়া সংসারী মানুষ ও। কী যে ব্যাপার, বুঝছি না।'

কাঁধটি ঈষৎ নেড়ে ও বক্রোক্তি করল, 'হ্যাঁ, সংসারী মানুষ।'

'কিন্তু ও ঠিক কী অপরাধ করেছে, তাকি বলবে দয়া করে ?' আমি আবার লীডাকে প্রশ্ন করলাম।

এর উত্তরে ও কিন্তু কিছুই বলল না। আমি যতবার প্রশ্ন করলাম কী ধরনের অসৌজন্য ও প্রকাশ করেছে, ততবারই উত্তর এল ও অসম্মান করেছে। কোনো হদিস পাওয়া গেল না আসল ঘটনার, শুধু জানা গেল যে ওকে তাড়াতেই হবে। যাই হোক অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর বোঝা গেল যে চুল ঠিক করে দেবার বেলায় এণ্টোনিওকে লীডার চেয়ারের খুব কাছাকাছি আসতে হয়েছিল। ওর নাকি সে সময় মনে হয়েছে যে এণ্টোনিও একাধিকবার নিজের শরীর ওর কাঁধ আর হাতের সংস্পর্শে এনেছে, ইচ্ছে করেই। সে অন্য কোনো ধরনের অসৌজন্য দেখায় নি বরং ধীর ভাবে নিজের কাজ করে গিয়েছে, একথা অবশ্য লীডা স্বীকার করল। কিন্তু এ কথাও লীডা বলল যে সে শপথ করে বলতে পারে, এ ধরনের ঘটনাগুলো একেবারেই আকস্মিক নয়, বরং এগুলো ইচ্ছাকৃত আর বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ধরনের আচরণ করে এণ্টোনিও যে বিশেষ এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে আর বিশেষ রকমের প্রস্তাব করতে চাইছিল, এতে ও একেবারে নিঃসন্দেহ।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'একেবারে নিঃসন্দেহ তুমি ?'

'না হয়ে কী করে আমি পারি বল ? আর তাছাড়া তুমি আমার কথায় সন্দেহ করছ কী করে সিলভিও ?'

'এ তোমার একটা ধারণা মাত্র হতে পারে।'

'ধারণা ? অসম্ভব। তাছাড়া ওকে দেখেইতো বেশ বোঝা যায় যে ও একটা দুর্বৃত্ত। ওর বিরাট টাক। গলা আর আড়চোখের চাউনি, এগুলো দেখে কি বোঝা যায় না ও একটা দুর্নীতিপরায়ণ লোক। তুমি কি অন্ধ ? আমি কি বলছি তাও কি বুঝতে পারছনা ?

'নাপিতের যা কাজ তাতে তো ওকে মক্কেলের খুব কাছাকাছি আসতেই হয়। মনে হচ্ছে ওটা একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র।'

'না, ওটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। একবার ঘটলে হয়তো তাই ভাবতাম, কিন্তু বারবার, অনেক বার ঘটার পর কী করে ওটাকে তুমি আকস্মিক বলবে ?'

ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে বেশ মজা পাচ্ছিলাম আমি। বললাম, 'তুমি এই চেয়ারটায় বসো দেখি। ধর আমি এণ্টোনিও। দেখি কী দাঁড়ায়।'

ও খুব চটে গিয়েছিল আর ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিল। তবু আমার কথায় একটা চেয়ারে বসে পড়ল। আমি যেন চুলে ঢেউ খেলানোর ইস্ত্রী ধরেছি এমনি ভঙ্গিতে পেন্সিল নিয়ে ওর চুলের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি ওই অবস্থায় আমার পেটের সঙ্গে ওর কাঁধ আর হাতের ঘর্ষণ এড়ানো মোটেই সম্ভব ছিলনা।

'এই দেখ, যা ভাবছিলাম ঠিক তাই। তোমাকে স্পর্শ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। তেমন যদি বল, তুমি একটু সরে বসতে পারতে।'

'আমি তো তাই করেছিলাম। ও আবার ও পাশে সরে দাঁড়ালো তখন।'

'ওপাশের চুলটি ঠিক করে দেবার জন্যই হয়তো তাকে ঘুরে যেতে হয়েছিল।'

'কিন্তু তুমি এত বোকা আর অন্ধ হয়ে গেলে কী করে সিলভিও। আমি বলছি ও বেশ ভেবে চিন্তে ইচ্ছে করেই এসব করেছে।'

একটা প্রশ্ন ঠোঁটের ওপর এসে পড়েছিল কিন্তু চেপে গেলাম। শেষে বললাম, 'আচ্ছা তোমাকে ছোঁয়ার কথা যে বলছ, ঐ সময়—কী বলে, ঐ যাকে উত্তেজনা বলা হয়, তা কি লক্ষ্য করেছিলে ওর মধ্যে ?'

মুখে ক্রোধের ছায়া মেখে আর দাঁতে একটা আঙ্গুল কামড়ে ধরে ও চেয়ারে বসেছিল একেবারে অগোছাল হয়ে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ও জোরের সঙ্গেই বলল, 'নিশ্চয়ই।'

আমার আশঙ্কা হল হয় আমি ওর কথা বুঝতে পারছি না নয় তো ওকে বোঝাতে পারছিনা আমি কী বলতে চাই। বললাম, 'তাহলে সে যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল, কী বল ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

এন্টোনিওর ব্যবহারের চাইতে আমার স্ত্রীর ব্যবহারেই যেন আমি বেশী করে বিস্মিত হলাম। ও তো আর ছোট্ট খুকী নয়। যথেষ্ট বয়স আর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। তাছাড়া এ ধরনের ঘটনাকে ও চিরকালই আমোদ মেশানো ঘৃণার চোখেই দেখে এসেছে। আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে এত ক্রোধ আর ঘৃণা না দেখিয়ে ওর উচিত ছিল ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে রসিকতা করে উড়িয়ে দেওয়া। আমি কিছুটা বিহ্বলভাবেই বললাম, 'শোন লীডা, এগুলোর সত্যি সত্যি কোনো মানেই হয় না। কাজের ভেতরে হঠাৎ সংস্পর্শে এসে পড়েছে আর একটু উত্তেজনা বোধ করেছে, এ তো যে কোনো লোকের পক্ষে ঘটা সম্ভব। ভীড়ে বা ট্রামে চলতে গিয়ে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো স্ত্রীলোকের দেহের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় আমিও কত বার এমনি উত্তেজনা বোধ করেছি।' ওকে শান্ত করে তোলার জন্য কিছুটা রসিকতা করেই বললাম, 'ইচ্ছে ছিল কিনা সেইটে দেখাই বড় কথা। ভগবান জানেন, রক্তমাংসের মধ্যে একটা দুর্বলতা মানুষের আছেই।'

ও কোনো কথা আর বলছে না। মনে হল ও গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। আঙুলের ডগা কামড়ে ধরে ও জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। ওকে ঠাণ্ডা করবার জন্য হাল্কা রসিকতার জের টেনে বললাম, 'একটা নাপিতের কথা ধরছ কেন, সাধুসন্ন্যাসীদের দুর্বলতা নেই ? হতভাগা এন্টোনিও হয়তো আশাও করেনি যে তুমি এতখানি রূপ আর কামনার সামগ্রী। তোমার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে ও বেচারা একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা তার বা তোমার কারও দিক থেকেই কাম্য ছিল না। ওগুলো ওইখানেই চুকেবুকে গেছে।'

এখনও লীডা নিরুত্তর রইল। আমি বলে চললাম, 'সব করা আর বলা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় এখন তোমার উচিত এ ঘটনাটাকে হাল্কাভাবে' নেওয়া। একথা আমি একশ বার স্বীকার করি যে একটু স্থূল আর গেঁয়ো ধরনের হলেও ব্যাপারটায় তোমার প্রতি অসৌজন্য দেখানো হয়নি বরং শ্রদ্ধাই জানানো হয়েছে। তুমি ত জান লীডা আদবকায়দার রকমফের আছে।'

কাজের পর আমি এমনিতেই বেশ খুশি হয়ে উঠতাম। আজ মনে হল যেন একটু সস্তা রসিকতাই বেশী করছি, একান্ত অশোভন-ভাবেই। তাই একটু গম্ভীরভাবে বললাম, 'আমি যে স্থূল রসিকতা করছি, তা বুঝি লীডা। তুমি আমাকে 'ক্ষমা কর। ব্যাপার কী জান, ঘটনাটা এমন যে এটাকে কোনো মূল্য আমি কিছুতেই দিতে পারছি না, বিশেষ করে আমি যখন জানি যে এণ্টোনিও নিরপরাধ।'

এতক্ষণ পরে ও কথা বলল, 'দেখ, এত কথার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জানতে চাই তুমি ওকে তাড়াচ্ছো কি না।'

সুখের সংস্পর্শে এসে যে মানুষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে, এ আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। আমি জানতাম গাঁয়ে আর অন্য নাপিত নেই। শহর থেকে যে-কোনো নাপিত এত পথ আসতে চাইবে না প্রত্যেক দিন, এও জানতাম। নিজে কামানোর প্রশ্নই ওঠে না কারণ ও বিদ্যে আমার জানা ছিল না। কামাতে গেলে কেটেকুটে একাকার হয়ে যাবে সারামুখ আর হাজার রকমের অসুবিধে সৃষ্টি হবে। যে কাজ এখন আমি করছি তার পক্ষে যাতে কোনো রকমের ঝঞ্ঝাট বা বাধা না আসে তার জন্য আমার নিজের দিক থেকে মনের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিও প্রয়োজন ছিল। তাই এক রকম জোর করেই বললাম, 'কিন্তু লক্ষ্মীটি, তুমি তো একথা প্রমাণ করতে পার নি যে এণ্টোনিও ইচ্ছে করে অসৌজন্য দেখিয়েছে। কোন্ অজুহাতে আর কেনই-বা আমি তাকে তাড়িয়ে দেব, বল?'

'যে-কোনো অজুহাতে,—বোলো, আমরা চলে যাচ্ছি।'

'কিন্তু কথাটা তো সত্যি নয়, এর পরেও তো আমাদের সে দেখবে।'

'আমার কী যায় আসে তাতে? আমি তো আর ওকে দেখছিনে!'

'না, এ কখনোই সম্ভব নয়।'

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল, এমন কি আমাকে দয়া দেখানোর জন্যও না?'

'লক্ষ্মীটি, তুমি একবার ভেবে দেখ, এতবড় অন্যায় একটি গরীব লোকের ওপর কেন করব? তাছাড়া ও...'

'গরীব? ও একটা ভীষণ শয়তান, নষ্ট চরিত্রের মানুষ।'

'আমার কামানোর ব্যাপারে কী করব আমি। তুমি জান অন্তত পনেরো মাইলের মধ্যে কোনো নাপিত নেই।'

'নিজেই কামাবে।'

'ও আমি পারি নে মোটেই।'

'তুমি কেমন মানুষ? নিজে কামাতে জান না?'

'না পারি নে, এর পর কী করতে পারি বল?'

'দাড়ি রাখতে শুরু কর।'

'ভগবানের দোহাই ও কথা বোলো না। আমার একটুও ঘুম হবে না।

একটু থেমে গেল লীডা। এরপর যখন কথা বলতে শুরু করল, মনে হল ও হতাশায় ভেঙে পড়েছে, 'তা হলে তোমায় যা বলছি তা তুমি করবে না, কিছুতেই না?'

'সত্যি বলছি লীডা...'

'থাক, বুঝেছি, আমার কথা তুমি রাখতে চাও না; ঐ জঘন্য ভীষণ লোকটা আমার সামনে আসুক এইটে তুমি চাও। আমাকে ওর সংস্পর্শে আসতে তুমি বাধ্য করছ।'

'তোমাকে কোনো কিছু করতেই আমি বাধ্য করছি না। ওর সামনে আসার কোনো দরকার নেই তোমার, তুমি তোমার ঘরে থাকবে।'

'তাহলে দাঁড়ালো এই যে আমার অনুরোধ তুমি রাখবে না আর আমাকে আমারই বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হবে, কেমন তাই না?'

আমি ওকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে কিছু বলতে চাইলাম, 'কিন্তু লীডা......।' ও বাধা দিয়ে বলল, 'দয়া করে আমায় একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও। তোমায় কত করে বলছি ওকে তাড়িয়ে দাও, তবু তোমার ঐ এক গোঁ কিছুতেই কথা রাখবেনা।'

স্থির করলাম একটু কঠিন মনোভাব দেখাবো এ ব্যাপারে। বললাম, 'শোন লীডা, এরকম কোরো না। এ এক বাজে খেয়াল। তোমার খেয়ালমত কাজ করা আমি পছন্দ করি নে। তোমার অভিযোগ সত্যি কিনা আমি দেখব। যদি দেখি সত্যি তবেই তাকে তাড়াবো, নইলে নয়।'

ও আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল। তারপর উঠে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল।

একা বসে বসে ঘটনাটি ভাবতে লাগলাম আমি। আমার কেবলই মনে হল ওর মধ্যে সত্য আমি যা বলেছি তার চেয়ে এক বিন্দু বেশী নেই। এন্টোনিও উত্তেজনা বোধ করে থাকতে আর তার এই মনোভাব দমন করতে সক্ষম হয় নি তাও অসম্ভব নয়, তবে এ কথা ঠিক যে এর সংস্পর্শে আসার স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টা সে করেনি। বড় জোর বলা যায় যে অনিচ্ছাকৃত মনোবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে কোনো চেষ্টাই সে করেনি। আমি জানি আগে থেকে ভেবে না নিয়ে বা কারোর প্রেমে সত্যি সত্যি না পড়েও আমরা মাঝে মাঝে বিচলিত হই।

নির্জন পরিবেশে এই কথাগুলো যখন দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবে দেখলাম তখন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমার মনের মধ্যে জমে-ওঠা অনুশোচনা দূর হয়ে গেল। বুঝলাম যে মুলত স্বার্থপর হয়েই কাজটি করেছি তবে আমি যে ন্যায়পরতার সাধারণ পথ থেকে বিচ্যুত হই নি এ কথা ভেবে আনন্দ পেলাম। এন্টোনিও যে সত্যিই নিরপরাধ এতে আমার সন্দেহ ছিল না তাই আমার মনে হল আমার স্ত্রীর খেয়াল চরিতার্থ না করে আমি যে আমার সুবিধাটুকু দেখতে চেয়েছি তাতে কোনো অন্যায় করিনি।

একটু পরে খাওয়ার টেবিলে লীডাকে দেখে একেবারে ঠিক প্রশান্ত না হলেও একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বলে মনে হল। ডিসগুলো নিয়ে পরিচারিকা একটু বাইরে যেতেই ও বলে উঠল, 'ঠিক আছে। এণ্টোনিও তোমার কাজ করুক, তবে এইটুকু ব্যবস্থা কর যাতে ও আমার সামনে না আসে, এমনকি সিঁড়িতেও না, তোমাকে আমি আগেই সাবধান করে দিলাম।'

খুব খারাপ লাগল। কথাটা যেন মোটেই শুনি নি এমনি ভান করলাম। ও আবার বলল, 'হয়তো সত্যিই এ আমার খেয়াল। কিন্তু আমার খেয়ালের মূল্য তোমার ব্যক্তিগত সুবিধার চেয়ে বেশী মূল্যবান হওয়া প্রয়োজন নয়কি ?'

মনে হল ও ঠিক বিপরীত কথাই বলছে। সেই সময় পরিচারিকাটি এসে পড়ায় আমাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল। পরে যখন দুজনে বেড়াতে বেরুলাম তখন আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। আমার মনে হল কথাটা আবার পাড়া দরকার, আর আমার যুক্তিগুলো যে অকাট্য তাও তাকে সুস্থভাবে জানতে দেওয়া দরকার। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে ও শান্তভাবে বলে উঠল, 'কিছু মনে কোরো না সিলভিও, ও কথা আর আমরা আলোচনা করব না। সকাল বেলায় ঘটনাটা খুব বড় করেই দেখেছিলাম। ভেবে দেখলাম সত্যিই আমি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। বিশ্বাস কোরো এ নিয়ে একটুও ক্ষোভ আমার মনে আর নেই।'

সে খুব সহজভাবেই কথাটা বলল ; মনে হল সকালের ব্যবহারে সে সত্যিই দুঃখ বোধ করছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'সত্যি বলছ লীডা ?'

প্রগাঢ় সরলতায় ও বলল, 'শপথ করে বলতে পারি। আর তাছাড়া মিথ্যা বলার কীইবা কারণ থাকতে পারে বল ?' এরপর এটা ওটা নানা কথা বলতে বলতে আমরা বেড়াতে লাগলাম। ও যে মন থেকে সে ঘটনাটাকে মুছে ফেলেছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো।

আট

আজকে বসে এন্টোনিওর ঘটনা বলতে গেলে পূর্বাপর বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে একটা মোটামুটি চিত্র খাড়া করতে পারি মাত্র। ইতিহাস যাঁরা লেখেন তাঁদের ক্ষেত্রে এই রকমই ঘটে মনে হয়। ঘটনা যতই গুরুত্বপূর্ণ হক না কেন সমসাময়িকদের চোখে তা মোটেই ধরা পড়ে না। যেমন বলা যায় ফরাসী বিপ্লবের শুধু দ্রষ্টারা নয় স্রষ্টা আর অংশগ্রহণকারীদের কাছেও ওটা নিতান্তই ফরাসী বিপ্লবই ছিল মাত্র। এন্টোনিও সম্পর্কিত উপাখ্যানটি সম্বন্ধে অপরে যাই ভাবুক না কেন ওটি আমার মনকে বিশেষভাবে দূরের কথা, একটুও বিচলিত করেনি। ওরকম ঘটনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। আমার আর আমার স্ত্রীর মধ্যে এ যাবত সম্পর্কটি বেশ সুখেরই রয়েছে। একটা সুন্দর আধুনিক ধরনের ঘরের মধ্যে মধ্যযুগীয় চোরা দরজা কেউই নিশ্চয় পছন্দ করবে না। আমার মনের নিরপরাধ অবস্থাটি আমি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছিলাম, যদিও আমি জানতাম এতে আমার স্বার্থপরতা আর চিন্তার অগভীরতাই প্রকাশ করছে। কারণ যাই হক, খারাপ কিছু ভেবে নেবার মত মানসিকতা আমার ছিল না। পরের দিন নির্দিষ্ট সময়ে যখন এন্টোনিও এসে পড়ল তখন আমার মধ্যে চাঞ্চল্য বা ঘৃণা কোনো কিছুরই লেশমাত্র ছিল না। স্ত্রীর অভিযোগের আলোকে লোকটির বিচারে আমার মনের এই স্থির ভাবটি সহায়তা করবে ভেবে আনন্দ হল। যথারীতি কখনো তার আমার কথা বলে যাওয়ার ফাঁকে (ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার কোনো আড়ষ্টতাই ছিল না) ওকে বেশ লক্ষ্য করলাম। আগের মতই ও যথেষ্ট সাবধানতা আর দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল। স্ত্রীর অভিযোগ যদি সত্যি বলে ধরে নিতে হয় তবে বুঝতে হবে মনের

অবস্থা গোপন করার পটুতা আছে এণ্টোনিওর। 'ও একটা পাকা শয়তান, কুৎসিত চরিত্রের লোক'—স্ত্রীর এই ধরনের অভিযোগ তখনও যেন আমার কানে বাজছিল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ঐ ধরনের অভিযোগ করার মত কিছুই ওর মধ্যে আমি পাচ্ছিলাম না। পাঁচটি সন্তানের পিতা হয়ে ও সমস্ত সংসারটির দেখাশোনা করে আর নিজের দৈহিক আরামের কথা মোটেই চিন্তা করে না, ওর মধ্যে বরং এই রকম একটা ভাব আমি লক্ষ্য করলাম। এণ্টোনিও নিশ্চয় উন্মাদ ছিল না। তাই আবার আমার মনে হল একেবারে উন্মাদ না হলে এধরনের একজন কদাকার মানুষ কখনোই আমার স্ত্রীর মত একজন অত্যন্ত অভিজাত সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমে পড়ার আশা করত না। দেখে সত্যিই আনন্দ হল যে লোকটা অত্যন্ত কদাকার। মুখে ডেলা ডেলা চর্বি জমেছে যা মোটেই আকর্ষণীয় নয়। ওর চিবুক আর গলার মাঝখানটা এত ফোলা যে দেখলে গরমের দেশে যে সাপগুলো রেগে গলা ফোলায় তাদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। কানটা অস্বাভাবিক রকমের বড় আর লতিগুলো ঝুলছে এ দিক ও দিক। গরমে পুড়ে টাকের ওপর নানা রঙের তালি পড়েছে। ওর সারা গায়ে অজস্র লোম। কানের ওপর, নাকের ভেতর এমন কি নাকের ডগাটাও লোমে ভর্তি। ওর ঐ কদাকার চেহারাটা বেশ আমোদের সঙ্গে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার পর একেবারে নির্বিকারভাবে বলে বসলাম, 'আমার বড় জানতে ইচ্ছে হয় এণ্টোনিও, তোমার মত পাঁচ ছেলের বাপ কখন মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়।'

একখানা কাগজে এণ্টোনিও ক্ষুরটা মুছে রাখছিল। আমার দিকে ক্ষুর হাতে ফিরে একটু হেসে ও বলল, 'সিনর ব্যলদেশী ওর জন্য সময় সর্বদাই পাওয়া যেতে পারে।'

আমি যে অন্য ধরনের উত্তর আশা করেছিলাম এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললাম, 'তোমার স্ত্রী সন্দেহ করে না?'

'স্ত্রী মাত্রেই সন্দেহ করে থাকে।'

'তাহলে তুমি স্ত্রীকে ভালবাস না ?'

ক্ষুরটা হাতে নিয়ে ও সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাফ্ করবেন সিনর, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

একটু উঁচুশ্রেণীর মানুষ তার নীচের মানুষদের এ ধরনের প্রশ্ন করতেই পারে এ রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা আমার ছিল। ওর উত্তরে তাই আমি একটু লজ্জিতই হলাম। সমানে সমানে যে ভাবে কথা হয় অনেকটা তেমনি এক পর্যায়ে ও আমাকে এনে ফেলেছিল। এ আমি মোটেই আশা করি নি। একটু বিরক্ত হলাম। বলতে ইচ্ছা হল, 'না, ব্যাপারটা শুধু তোমার একার নয়, আমারও বটে কারণ আমার স্ত্রীকে বিরক্ত করার মত স্পর্ধা তুমি দেখিয়েছ।' কিন্তু নিজেকে সংযত করে একটু যেন বিভ্রান্তভাবেই বললাম, 'তুমি কি ক্ষুণ্ন হলে এন্টোনিও ? আমি কিন্তু তা চাই নি।'

ও বলল, 'মোটেই না।' এর পর ক্ষুর দিয়ে ও খুব সুন্দর করে কামাতে শুরু করল। মনে হল ও যেন তার প্রথম শানিত মন্তব্যটিকে সামলে নিয়ে আমার মনোবেদনা দূর করতে চাইছে। তারপর হঠাৎ এক সময় ও বলে উঠল, 'আচ্ছা সিনর ব্যলদেশী, আমার তো মনে হয় সব পুরুষই স্ত্রীলোক পছন্দ করে। ওই তো স্যান লোরেন্সের ধর্মযাজকটিরও একটি স্ত্রীলোক আছে। ওর আবার দুটি সন্তানও হয়েছে। প্রতিটি মানুষের মগজের মধ্যে যদি আপনি উঁকি দিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন কোনো না কোনো স্ত্রীলোক ওর মধ্যে রয়েছে। তবে মজা কি জানেন, পাছে লোকে এ নিয়ে গুজব রটায় তাই ও সব কেউ কাউকে বলতে চায় না। আর আপনিও জানেন যে মেয়েরা বেশী কথাবার্তা পছন্দ করে না।'

প্রেমের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সে একটা সারগর্ভ বাণী শুনিয়ে দিল আমাকে। যাই হক এখন কিন্তু একটু সন্দেহ আমার মাথায় জাগলো যে স্ত্রীর অভিযোগের মূলে কিছু সত্য থাকতেও পারে।

চাষীর বড় ছেলে এঞ্জেলো সপ্তাহে একদিন হিসেবপত্র করবার জন্য আমার কাছে বিকেলের দিকে আসত। পড়ার ঘরে বসে কিছুক্ষণ হিসেব পরীক্ষা করে দেখার পর এণ্টোনিওকে ও চেনে কি-না আর ওর সম্বন্ধে ওর ধারণা কী তা জানতে চাইলাম। এঞ্জেলোর ভেতর কেমন একটা নির্বোধ ধূর্ততার ছাপ ছিল। ও একটু পরশ্রীকাতর হাসির সঙ্গে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এণ্টোনিওকে আমরা বেশ ভাল করেই জানি।' এরপর একটু ইতস্তত করে ও আবার বলল, 'নাপিত হিসেবে কিন্তু ওর জুড়ি নেই।'

'কিন্তু···'

'ও এখানে নতুন এসেছে। বিদেশী লোকদের ধরন ধারণ যে পৃথক হয় এতো সবাই জানে। মনে হয় যেখান থেকে ও এসেছে সেখানকার আদবকায়দা সম্পূর্ণ পৃথক।'

'কেন বল তো?'

মাথা নেড়ে হেসে ও উত্তর দিলে, 'কারণ অবশ্য অনেক আছে।' ওর হাসির মধ্যে একটা সবজান্তা ভাব ফুটে উঠল। ও যে এণ্টোনিওকে মোটেই পছন্দ করে না আর তারও যে বেশ মজার মজার কারণ আছে এইটে ওর হাবভাবে ফুটে উঠল।

'দু-একটা উদাহরণ দাও তো শুনি,' জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ও যেন হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল। কথাগুলোর মধ্যে জোর দিয়ে ও একটু উদ্দীপ্তভাবেই বলল, 'দেখুন সিনর, প্রথম কথা—ও মেয়েদের বড় জ্বালায়।'

'সত্যি?'

'আঃ কেন বলেন! আর যা ও করে তা আপনার ধারণার বাইরে। সুন্দরী হক আর কুৎসিত হক, যুবতী হক আর বৃদ্ধা হক মেয়েছেলে হলেই হল। যারা কেশ বিন্যাসের জন্য ওর দোকানে যায়, শুধু তাদেরই নয়, বাইরেও ওর কারবার এই রকম। যাকে খুশি আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। যেমন আপনারা শিকারে বেরোন,

ও তেমনি রোববার হলেই সাইকেলটি নিয়ে পাড়ার পাড়ায় ঘুর্ ঘুর্ করতে বেরোয়। একটা জঘন্য ব্যাপার। তবে এ কথাও আপনাকে বলে রাখি যে এরই মধ্যে ও এমন কোনো লোকের পাল্লায় পড়বেই পড়বে যে ওর এ অভ্যেসটা চিরকালের মত ঘুচিয়ে দেবে।' এঞ্জেলোর স্বাভাবিক গম্ভীর ভাব কেটে গিয়ে একটা বাচাল স্বভাব বেরিয়ে এল। কোনো কোনো কৃষক যখন দেখে যে তার মনিব তার কথা শুনতে চাইছে, তখন সে যেমন করে এলো-মেলো নানা কথা বলতে থাকে, এও তেমনি নানা নীতি-উপদেশ ছড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল।

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু ওর স্ত্রীর খবর কী?'

'আহা বেচারা! ও আর কী করবে বলুন? ও কাঁদে আর কাজকর্ম করে। স্ত্রীকে ও কামানোর কাজ শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে খদ্দেরদের ভার ওর উপর দিয়ে শহরে যাচ্ছে বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যায়। আসলে যায় মেয়ে খুঁজতে। কেন, এই যে গত বছর…'

ওর কাছ থেকে আর বেশী কথা শোনা আমার পক্ষে অমর্যাদাকর মনে হল। এন্টোনিও সম্পর্কে আমার যা জানা দরকার তা ইতিমধ্যেই জানা হয়ে গিয়েছিল। কথার মোড় ফিরিয়ে নিলাম আর কিছুক্ষণের পর বিদায় দিয়ে দিলাম ওকে।

এর পর একা একা বসে নানা চিন্তায় ডুবে গেলাম আমি। বুঝলাম আমার স্ত্রী সত্যি কথাই বলেছে, অন্তত কথাটা বিশ্বাস করার মত কারণ যথেষ্ট আছে বলেই মনে হল আমার। এন্টোনিও যে চরিত্র-হীন আর সে যে আমার স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল এ কথা বিশ্বাস করা যায় এখন। ওর কাজ থাকল কি গেল, ওর পরিবারের কী হল অথবা রাজনীতি নিয়ে কেন যে ও মাথা ঘামায় না তা এখন বুঝলাম। ওর সম্বন্ধে যে আর-কোনো বাধা রইল না এইটেই এখন বড় বাধা হয়ে উঠল। বুঝলাম ও পুরোদস্তুর ব্যভিচারী। এও বুঝলাম যে ওর নীরব তোষামুদে ধরনটি মেয়েরা নাকি খুব পছন্দ করে, অন্তত ওর কথা থেকে ত তাই জানা গেল।

আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। এণ্টোনিও যে এতটা নিকৃষ্ট তা আমি আগে ভাবিনি। ওকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হত তাই ওকে আমার ভালই লেগেছিল। রহস্যের কুয়াসা কেটে গিয়ে এণ্টোনিওর যে রূপটি বেরিয়ে এল তা হল একটা নোংরা মানুষের ছবি ; যে ওর সমাজের এমন কি আমার স্ত্রীর মত উঁচু সমাজের মেয়েদেরও বিরক্ত করে বেড়ায়। ওর ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তথ্য জানতে পেরে আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলাম। ওর প্রতি লীডার ঘৃণা অনেক আগেই আমার মধ্যে সংক্রমিত হতে পারত। ওকে আমি ঘৃণাও করতাম হয়তো। ওর সব কথা জেনে শুধু ওর ওপরই যে আমার করুণামিশ্রিত ঘৃণার ভাব জন্মালো তা নয়, নিজের ওপরও ঘৃণা ধরে গেল। মনে হল হঠাৎ আমি ঐ গেঁয়ো ডন জুয়ানটার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার হীন স্তরে নেমে এসেছি।

এখন এ ধারণা আমার দৃঢ়তর হল যে ও আমার স্ত্রীর দিকে সাহস করে শুধুমাত্র চোখই তোলে নি, নিজের পদ্ধতিতে ওর মনোভাবও জানাতে চেয়েছে। ও যে একটা অসংযমী মানুষ আর প্রথম স্পর্শের আকস্মিক প্রভাবে যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল এতে আর সন্দেহ রইল না। এটা যুবকদের পক্ষে হয়তো সম্ভব কারণ তাদের অনুভূতির তীব্রতা থাকে, কিন্তু চল্লিশের বেশী বয়সের কোনো মানুষের দিক থেকে এ ব্যবহার আশা করা যায় না। তবে একটা ব্যভিচারীর পক্ষে এ রকম ব্যবহার সম্ভব কারণ ওরা এই ধরণের স্পর্শকাতরতারই অনুশীলন করে থাকে। অদম্য উত্তেজনার প্রকাশ এদের দিক থেকেই সম্ভব। আমার স্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে ও যে খুশি আর উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল এতে আর অবিশ্বাস করার কিছু রইল না।

এটা খুবই সত্য যে ওর ওপর আমার বিশ্বাসপ্রবণতার মূলে ছিল স্বার্থ চিন্তা। স্বার্থটি আর কিছু নয় ও থাকলে নিজে কামানোর ভয় থেকে রক্ষে পাই আমি।

এঞ্জেলোর সঙ্গে কথাবার্তার পর নিয়মমাফিক স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে

বেরোলাম। মনে হল এখন বোধ হয় আমি আমার স্ত্রীকে প্রতারণা করছি। তবুও এঞ্জেলোর থেকে যা জেনেছি তা বলা খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলনা। আমি বেশ বুঝলাম এসব কথা পাড়লেই ওর মধ্যে যে ক্রোধবহ্নি নির্বাপিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তা আবার নতুন করে জ্বলে উঠবে। আমার মন এক অনিশ্চিত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। একসময় ওকে একটু অন্যমনস্ক দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এন্টোনিও যে তোমার অসম্মান করেছিল, সে কথাই ভাবছ বুঝি ? তুমি যদি চাও ওকে আমি নিশ্চয় তাড়িয়ে দেবো।'

এবার ও এন্টোনিওর বিরুদ্ধে কিছু বললে ওকে আমি নিশ্চয়ই খুশি করতাম। নিজের স্বার্থপরতায় বেশ আঘাত পেয়েছিলাম আমি। একটু উৎসাহ দিলেই কিন্তু এবার এন্টোনিওকে তাড়াতাম। ও চমকে উঠে বলল, 'নাপিতটার কথা ভাবছি ? না, মোটেই না। সত্যি কথা বলতে কি ও আমি একেবারে ভুলেই গেছি।'

ওর আন্তরিক আগ্রহহীনতায় আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম ; ভাবলাম আমার প্রস্তাব এবার আর বাতিল হবে না, 'তুমি চাইলে, আমি ওকে নিশ্চয় তাড়াবো।'

'না, আমি তা তোমায় বলতে পারি না,' বলে উঠল আমার স্ত্রী। 'ওতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি বিশ্বাস কর, কিছু যে একদিন ঘটেছিল এ আমি একেবারেই ভুলে গেছি।'

'কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি জান ?'

খুব গভীর চিন্তার পর ও বলল, 'ও তোমার একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ও এখানে এলে তুমি বিরক্ত হও কি না হও, সে তুমিই ভেবে দেখবে।'

'আমি ত মোটেই বিব্রত বোধ করছি না।'

'তাহলে তুমি তাকে তাড়াতে চাইছ কেন ?'

একটু হতাশ হলেও ওর যুক্তি-নির্ভর ব্যবহারে খুশিই হলাম আমি। কপাল গুণে আমার সৃজনীশক্তির পূর্ণ বিকাশের আনন্দে আমি তখন

পরিপূর্ণ। অন্যদিকে, এই আনন্দের আতিশয্যে আমার আচরণে প্রকাশিত অন্য চিন্তা ভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করার মত শক্তি আমি হারিয়ে ছিলাম। পরের দিন যথারীতি এন্টোনিও এলো। লক্ষ্য করলাম, এঞ্জেলোর কাছ থেকে এত খবর পাওয়ার পরেও ওর উপস্থিতিতে আমি কম আনন্দ পেলাম না। আগে ওর সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না তাই ওকে রহস্যময় মনে করতাম। আজ আমি ওর সব কিছু জেনে ফেলেছি বলেই ও আমার কাছে সমান রহস্যাবৃত। রহস্যময়তাটি আগে একটা দুর্গম অঞ্চলেই যেন ছিল, এইটুকু প্রভেদ। ছোট বড় সব কিছুর বেলায় এই ধরনের রহস্য রয়েছে, তার একটা ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। শুধু তার অবস্থিতির কারণটুকু কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না।

নয়

পরবর্তী দিনগুলো এক অদ্ভুত প্রেরণা আর কাজের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। আমার কাজ যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই যেন এই শক্তিগুলো বেড়ে উঠে তার চরম পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছল। এন্টোনিও প্রত্যেক দিনই আসত। প্রথম দিকের বিহ্বল ভাবটা কেটে যাওয়ার পর আবার ওকে অটুট অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে লক্ষ্য করে যেতে থাকলাম। এখন যেন ওর আমার মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা মৌন হলেও অস্পষ্ট নয়। স্ত্রীর প্রস্তাব মত যদি তখনই ওকে সরিয়ে দিতাম তাহলে নিশ্চয় এটি ঘটত না। এই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। আগে এন্টোনিওর সঙ্গে ছিল মনিব ভৃত্যের সম্পর্ক। স্ত্রী ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার পর সে সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে গিয়ে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এন্টোনিও আমার সম্মানহানি করেছে, অন্তত করেছে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। কারণ আমার সঙ্গীর সম্মান আর আমার সম্মান, একই কথা। স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাই দিয়েই কথাটা বিচার করছি। অবশ্য এই সম্পর্কগুলো নিতান্তই রীতিগত। একজনের সঙ্গে মাইনে দেওয়া-নেওয়াকে আশ্রয় করে মনিবের সম্পর্ক অন্য জনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন নির্ভর স্বামীর সম্পর্ক। দুটোকেই কম বেশী কল্পিত সম্পর্ক বলতে পারি। এন্টোনিওকে বরখাস্ত করতে বলে আমার স্ত্রী আমাকে প্রধানত ঐ দুটো সম্পর্কের ওপরই পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে বলেছিল। যাই হক স্ত্রীর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করি নি আর এন্টোনিও যথারীতি কাজ করে চলেছে। আমার জায়গায় অন্য যে-কেউ কিন্তু অন্যরকমের ব্যবহার করত। স্বামী আর মনিব হিসেবে

স্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আমি এমন এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথ খুলে দিলাম যা নিশ্চয় আমাদের রীতিনীতির ওপর নির্ভর করবে-না, বরং বলা যায় যে এর পরিণতি নির্ভর করবে ঘটনার বাস্তব অবস্থার ওপর। আমার স্ত্রী যে মনোভাব অবলম্বন করার প্রস্তাব আমার কাছে উপস্থিত করেছিল সেটি নিতান্তই প্রথানুগ আর বাইরের ঠাট বজায় রাখতে চাইলে ও পথ অবলম্বন না করে আমার উপায় থাকত না। এর বাইরে গেলে যে-কোনো রকম ঘটনার সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। তবু আমি এন্টোনিওর সঙ্গে পূর্বের সুপরিচিত সম্বন্ধই বজায় রেখে চললাম। আমার স্ত্রী যে সমাধানের পথ দেখিয়েছিল তা অবলম্বন না করে আরও একটা পথ আমি দেখেছিলাম, তা হল বাস্তব পরিবেশ-নির্দেশিত পথ। এ যেন গতিশীল একটি নদী যাকে হয় দু দিকের কৃত্রিম বাঁধের বন্ধনে সংযত করা যায় নয় তো ভূমির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে খেয়াল মত বয়ে যেতে দেওয়া যায়। যে পথই গ্রহণ করা হক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু নদী তার নিজের গভীরতার ওপর নির্ভর করে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাবেই। এই কথাগুলো বেশ প্রাঞ্জল আর ধারাবাহিক ভাবেই ভেবে নিতে পারলাম কিন্তু ওগুলো ঠিক গভীর কোনো চিন্তার রূপ না নিয়ে বরং একটা অস্পষ্ট অনুভূতির রূপ নিয়েছিল আর এও বুঝেছিলাম পূর্বের অবচেতন আনন্দময় সত্তার পরিবর্তে সচেতন বিরাগই এর উৎস।

আমার চোখের সামনে যখন ঘটনার এই ধরনের পরিণতি ঘটছে আর আমার সবচেয়ে মূল্যবান প্রীতির অনুভূতিগুলো পরিবর্তিত হতে চলেছে তখনও আমার দিক থেকে এইরকম চিন্তা বা অনুভূতি বিস্ময়কর নিশ্চয় মনে হতে পারে। কিন্তু যে কথা আমি বারবার বলেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে আবার বলতে চাই যে আমি যে সৃজন-মূলক কাজে (অন্তত আমি তাই ভাবতাম) নিযুক্ত ছিলাম, তার বাইরে কোনো কিছুর দিকেই আমার দৃষ্টি ছিল না। স্ত্রীর প্রতি আমার ভালবাসা কমে গিয়েছিল বা নিজের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে

আমি উদাসীন হয়ে ছিলাম, এ কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আসলে এসব কিছুর গুরুত্ব একত্রিত হয়ে গিয়ে পড়েছিল আমার লেখা পাতা-গুলোর ওপর। এন্টোনিও তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখায় নি এ অভিযোগ না করে যদি আমার স্ত্রী বলত যে সে আমার গল্পলেখা কাগজের একটা পৃষ্ঠায় এন্টোনিওকে ক্ষুর সাফ করতে দেখেছে তাহলে তার নির্বুদ্ধিতা আর দায়িত্বহীনতার অপরাধে তাকে আমি তক্ষুণি তাড়িয়ে দিতাম। ওর ওপর যে অপরাধের বোঝা চাপানো হয়েছে তার চেয়ে এ ধরনের অপরাধ অনেকখানি যুক্তিযুক্ত আর ক্ষমার যোগ্য হত। আমার দিক থেকে উদাসীনতার মূল কারণ হল ও যা করেছে তার সঙ্গে আমার স্ত্রী জড়িত। আমার কাজের ক্ষতি করার কোনোপ্রকার সম্ভাবনা যদি থাকত তবে আমার দিক থেকে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এইখানেই একটা রহস্য থেকে গিয়েছিল আর রহস্যের সূত্র ছিল আমারই মধ্যে, তাই এঞ্জেলো সব কথা ফাঁস করে দেওয়ার পরও এর সমাধান হয় নি। সব জানা আর সবকিছু করার পরও এই ধরনের একটা রহস্য সৃষ্টি হয়, হবেও চিরকাল। মানুষ যে-কোনো জিনিসের গভীরতায় যতই নামবে ততই সে এইরকম রহস্যময়তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবে।

এরপর থেকে এন্টোনিও যখন কামাতে আসত তখন বোধ হয় আমার স্ত্রী তার পড়ার ঘরের মধ্যেই থাকত কারণ আগের মত সে আর কামানোর সময় আমার ঘরে এসে বসত না। সে যে যুক্তিনিষ্ঠ একটা অনুমানে নির্ভর করে তার পূর্বেকার মানসিক প্রতিক্রিয়া বিসর্জন দিতে পারছে না এতে কিন্তু আমি বিরক্ত হয়ে উঠলাম। ঠিক কখন আর কী ভাবে মনে নেই, তবে ও সকালে আমার কাছে কেন আসেনা সে প্রশ্ন ওকে আমি করেছিলাম। একটু অস্থিরতার সঙ্গে না চটে গিয়ে ও উত্তর দিয়েছিল, 'সত্যি সিলভিও, তোমার বুদ্ধির পরিমাণের ওপর আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে। লোকটাকে তার অভদ্রতার জন্য কোনো শাস্তিই তুমি দিলে না। এর পর কী

করে আমি তোমার কাছে আসতে পারি বল? এলে, ও ভাববে ওকে আমি ক্ষমা করেছি বা অন্য রকম খারাপ কিছু ভেবে বসতেও পারে। না এলে বরং ও ভাববে যে ঐ কুৎসিত ঘটনাকে আমি এড়িয়ে যেতে চাইছি।'

জানি না কোন সূক্ষ্ম শয়তানী বুদ্ধির প্রভাবে আমি বলে বসলাম, 'ঘটনাটা তুমি লক্ষ্যই কর নি এমন কথাও সে ভেবে নিতে পারে। আরও বিশ্রী হবে, সে যদি ভাবে যে তুমি সবকিছু লক্ষ্য করে নিজেও কিছু কর নি বা আমাকে দিয়ে কিছু করাও নি।'

ও খুব শান্ত ভাবে উত্তর দিল, 'একটিই মাত্র সমাধান ছিল এসবের, আর তা হল সেদিনই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া।'

দশ

শেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত মুহূর্তটি এল আমার জীবনে যে দিন সকালে আমার গল্পলেখার খাতার শেষ পাতার শেষ ছত্রে শেষ শব্দটি বসিয়ে দিলাম। কেবলই মনে হল যে আমি অনন্তকাল ধরে এক অমানুষিক কাজ করে আসছিলাম। আসলে দিন কুড়ি ধরে আমি ছাপার অক্ষরে লেখা বইএর প্রায় একশ পাতার মত রচনা তৈরি করেছিলাম। লেখার খাতাখানা নিয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। যন্ত্রচালিতের মত পাতাগুলোর ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে, মনে নেই কেন, আমার দুটো চোখ জলে ভরে এল। তার কারণ দীর্ঘশ্রম-জনিত ক্লান্তি না কর্ম সমাপনের আনন্দ আজ তা ঠিক বলতে পারব-না। এ কথা না ভেবে পারলাম না যে আমার অতীত আর ভবিষ্যৎ জীবনের যে সাফল্য আজ থেকে আমি বহন করতে চলেছি তারই সোনালী ফসল সঞ্চিত হয়েছে এই রচনার মধ্যে। পৃষ্ঠাগুলোর ওপর চোখ বুলোতে গিয়ে আবার মনে হল আমার দৃষ্টিশক্তি আবছা হয়ে আসছে আর এও বুঝলাম দু-চার ফোটা চোখের জলও হাতের ওপর ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম সাইকেলে এণ্টোনিও এসে পড়েছে। তাড়াতাড়ি লেখার খাতাটা টেবিলে রেখে, চোখ মুছে আমি প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

এণ্টোনিওর চলে যাওয়ার পর শোবার ঘরে গিয়ে পোশাক বদলা-নোর ফাঁকে আমি আমার সাহিত্যকর্মের কথা আবার ভাবতে শুরু করলাম। অন্যান্য দিন শুধু সেদিনের লেখাটুকুর কথাই ভাবতাম। আজ কিন্তু সারা রচনাটির কথা পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভেবে চললাম। একান্তে আমি যেটিকে আমার সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি বলেই ভেবেছি তাই আমার সামনে পড়েছিল। ওটিকে

সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করার শক্তি হয়েছে আমার এখন। খুব কষ্ট আর ক্লান্তিকর শ্রমের মধ্যে ছোট ছোট দৃশ্য দেখতে দেখতে কোনো লোক যখন পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছয় আর পুরো দৃশ্যটি এক নজরে দেখতে পায় তার যেমন আনন্দ হয়, আজকের আমার আনন্দটি অনেকটা সেই ধরনের। যখন লিখে চলেছিলাম তখন যেন সময় তার গতি হারিয়ে ফেলেছিল। এইসব যখন ভাবছি তখন হঠাৎ আমার স্ত্রী চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকল ; 'কি এমন কাজ করছ বলত ? ও দিকে প্রায় ঘণ্টাখানেক হল খাবার তৈরি।'

ড্রেসিং গাউন-পরা অবস্থায় আমি বিছানায় বসেছিলাম। গত রাত্রের কাপড় চোপড়গুলো তখনও চেয়ারের ওপর পড়েছিল। ঘড়িতে দেখলাম দুটো বেজেছে, তার মানে এন্টোনিও প্রায় পৌনে একটায় চলে গেছে। একটা মোজা পরে আর অন্যটা হাতে নিয়ে আমি ঠায় বসে রয়েছি প্রায় সওয়া ঘণ্টার মত। খুব বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলাম, 'সত্যিই আমি দুঃখিত। কী যে হয়েছে আমার, জানি নে। তুমি এগোও, আমি এখুনি আসছি।' এর পর তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নীচে নেমে গেলাম।

উৎসাহের প্রথম জোয়ারে ভাঁটা পড়তেই নতুন এক প্রশ্ন জেগে উঠল মনের মধ্যে। স্থির ছিল লেখাটা শেষ করেই ওকে পড়ে শোনাব। নিজের চেয়ে তো বটেই, অন্য যে-কোনো সমালোচকের চেয়েও ওর ওপর আমার আস্থা ছিল অনেক বেশী। ওযে খুব মানসিক উৎকর্ষসম্পন্না নয় বা ওর যে কোনো সাহিত্যিক রুচি নেই এ কথা আগেই বলেছি। সাধারণ পাঠকের মত কাহিনীর আঙ্গিকের চেয়ে আখ্যানভাগের ওপরই ওর নজর বেশী করে পড়ত। কিন্তু ওর সিদ্ধান্ত যে কোনো অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির মতই প্রায় হয়ে দাঁড়াবে জেনেই বোধহয় ওর ওপর এত বেশী আস্থা জন্মেছিল আমার। লেখাটা মোটামুটি চলনসই হয়েছে, এর বেশী কিছু অর্থাৎ তার সাহিত্যমূল্য সম্বন্ধে কোনো সঠিক হদিস যে ও দিতে পারবে না তা আমি জানতাম।

আর তা ছাড়া যে-কোনো বই সম্বন্ধে প্রথম বিচার্য বিষয়ই হল তার প্রাণবত্তা। এমন অনেক বই আমরা পড়েছি বা ভবিষ্যতে পড়বও যেগুলোর রচনাপদ্ধতি নিতান্তই ত্রুটিপূর্ণ, ভাষা অপটু আর ঘটনা-সংস্থান অসঙ্গত। তবু ওগুলোর মধ্যে কখনো কখনো একটা প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়। এমন বইও আবার আমরা পেয়েছি যেগুলো সব-দিক থেকেই ত্রুটিশূন্য, কাহিনী সুবিন্যস্ত আর রচনা-কৌশল সুসংস্কৃত ; তবু এমনি ধরনের অনেক রচনাকে প্রাণহীন মনে হয়েছে, আর যথেষ্ট কারণ না দেখিয়েও ওগুলোকে আমরা একেবারে বাতিল করে দিয়েছি। সুদীর্ঘ কাল পড়াশোনা আর সমালোচনার পর এ ধরনের সিদ্ধান্তে আমি পৌঁচেছি। বইটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে কি-না এইটেই জানা আমার দিক থেকে প্রথম প্রয়োজন বলে অনুভূত হল, আর আমি জানতাম যে আমার স্ত্রীর চেয়ে এ বিষয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মন্তব্য কেউই করতে পারবে না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করব যে শান্ত মনে এ পরীক্ষার জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। এর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তাও ছিল। লেখাটা বড় তাড়াতাড়ি তৈরি করেছিলাম তাই ওর সাহিত্যমূল্য-সম্পর্কে নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তাই বলে ওর প্রাণসম্পদ সম্বন্ধে কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এর আগে যখনই আমি লিখতে চেয়েছি তখন যে শক্তিহীনতা, কুতর্ক আর মানসিক বিশৃঙ্খলা আমার লেখাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে সেগুলো হ্রাস না পেলে এ লেখা যে সম্ভব হত না তা আমার জানা ছিল। আমি কি বুঝতে পারিনি যে আমার মধ্যে যেন একটা জলাধার তার বন্ধন ভেঙে শান্ত ছোট্ট নদীর আকারে বয়ে না এসে, এসেছে উত্তাল বন্যার মত। এও কি বুঝতে পারিনি আমার ব্যক্তিস্বরূপ অত্যন্ত স্বচ্ছভাবেই আমার রচনার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। নানা ধরনের এমনি চিন্তাভাবনা আমার মনে উদিত হতে লাগল, এমন কি লেখাটা পড়ার পর স্ত্রীর মনে কী ধারণা জন্মাবে তাও ভাবতে লাগলাম আমি।

রচনাটি পড়ার দিক থেকে কয়েকটা বাস্তব অসুবিধে ছিল। লিখতে গিয়ে বেশ কিছু সংযোজন আর পরিবর্জন আমাকে করতে হয়েছে ছত্রগুলোর ভেতরে ভেতরে। এতে পড়াটা গোলমেলে আর বিরক্তিকর হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। পড়তে গিয়ে একটানা একটি তৃপ্তিকর পরিবেশ আমি সৃষ্টি করতে চাই, কিন্তু লেখার মধ্যে কাটাকুটি থাকার দরুন এ পৃষ্ঠা ও পৃষ্ঠা হাতড়ে গল্পের হারানো সূত্র খোঁজার চেষ্টা করতে হবে হয়তো। তাছাড়া কোথাও কোথাও প্রয়োজনীয় সংযোজনের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাই মনে হল লেখাটা এখুনি পড়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আনন্দের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। লীডার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নানা বিষয়ে কথা কইতে লাগলাম। কিন্তু ঐ ফাঁকে মনের মধ্যে লেখাটা পড়ে শোনানোর ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করে বসলাম। দিন দশের মধ্যে পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করে নিয়ে তারপর পড়া ভাল। তাছাড়া এও *ঠিক* যে এভাবে ওটাকে টাইপ করতে গেলে ওর মধ্যে যেসব ভুলচুক থেকে গেছে সেগুলোরও সংশোধন হয়ে যাবে, আর লেখার অঙ্গসৌষ্ঠবও নিঃসন্দেহে ত্রুটিমুক্ত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এই দশ দিন ধরে আমি আমার শ্রেষ্ঠ-কীর্তির অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একক ঘনিষ্ঠতায় কাটাতে পারব। শেষের এই যুক্তিই আমার কাছে ক্রমে বড় হয়ে উঠল।

রোম থেকে আমার টাইপরাইটারটি সঙ্গে এনেছিলাম। ওটাতে মাঝে মাঝে দু-একটা প্রবন্ধ আর চিঠিপত্র টাইপ করা ছাড়া কিছু হয়নি, তাই ওই আমেরিকান মেসিনটি প্রায় নতুনের মতই ছিল। ওটি খুব ভাল আর একেবারে আধুনিক মডেলের জিনিস তবু পূর্বের মানসিক অস্বস্তির সময়গুলিতে ওই মেসিনটি দেখলে আমার খুব খারাপ লাগত। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হত আমি একজন ধনী আর অক্ষম লেখক যার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির সবকিছু উপাদানই মজুত আছে, যেমন সময়, অর্থ, লেখার ভাল কাগজ, দামী কলম, আরাম-প্রদ শান্ত পড়ার ঘর—সব ; নেই শুধু একটি জিনিস যা হল প্রতিভা।

[ছেলেদের পড়ার যে কমদামী অর্থ বইগুলোর পাশে তারা পেন্সিল দিয়ে কাফেতে বা সস্তাদরের হোটেলে বসে নোট লেখে সেগুলোর ওপরই হিংসা জন্মায় এই শ্রেণীর লেখকদের।] এখন অবশ্য টাইপরাইটার দেখলে মন বিষিয়ে যাওয়ার ভাবটা বা অন্যান্য মানসিক অস্বস্তি আর ছিল না। সেই অবসর, সম্পদ সবই আমার আছে—তবু আমি সাহিত্য সৃষ্টি করেছি ; দামী কাগজ, কলম, পড়ারঘর, টাইপরাইটার সে সবই আগের মত আমার আছে—তবু আমার মহৎ সাহিত্যকীর্তি রূপ নিয়েছে। আমার বিশ্বাস, যারা সৃষ্টিধর্মী অথবা নিজেদের স্রষ্টা বলে মনে করে তাদের জীবনেই এই ধরনের কুসংস্কারগুলো চেপে বসে।

বিকেলে টাইপরাইটারটি নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম টাইপকরার কাগজগুলো রোমে ফেলে এসেছি। গাঁয়ে সে কাগজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে শহরের যে দোকান অফিস সরঞ্জাম সরবরাহ করে সেখানে হয়তো এ কাগজ মিললেও মিলতে পারে। এ দিকে আবার সে দিন শহরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না কারণ আমার যাওয়ার একমাত্র যান, চাষীর সেই এক ঘোড়ার গাড়িটি সকালেই শহরে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরের দিন শহরে যাব স্থির করে রাত্রে স্ত্রীকে বললাম, কয়েকটা কেনা কাটার জন্য আমি সকালে শহরে যাচ্ছি। ঠিক কী কিনতে যাচ্ছি তা বললাম না, তবে মামুলীভাবে ওকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলাম। সে যে সেই কষ্টকর এক্কা চেপে যেতে চাইবে না তা আমি জানতাম। তাছাড়া আমার দিক থেকেও একটা নির্জন পরিবেশ কাম্য ছিল। কেন যাচ্ছি এসব কিছুই জানতে না চেয়ে ও সোজাসুজি আমার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করল। পরে জিজ্ঞেস করল, 'ফিরছ কখন ?'

বললাম, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দুপুরের আগেত বটেই।'

একটু থেমে সাধারণভাবেই ও আবার জিজ্ঞেস করল, 'নাপিত এসে পড়লে কী করা যাবে ?'

আমিও একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিলাম, 'ওর এসে পড়ার আগেই

আমি ফিরব। আর যদি একটু দেরি হয়েই যায়, ওকে অপেক্ষা করতে বোলো। শহরের নাপিতদের ক্ষুর নানাধরনের খদ্দেরদের ওপর ব্যবহার হয়। ওখানে কামাতে ভাল লাগবে না আমার। এণ্টোনিও কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসত না। যাকিছু দরকারী জিনিস সবই আমি সরবরাহ করতাম।

এ নিয়ে আর কোনো আলোচনা না করে আমরা অন্য কথায় গিয়ে পড়লাম। কাজ শেষ হবার পর স্ত্রীর ওপর আমার প্রেম যেন প্রবলতর হয়েই মনের মধ্যে ফিরে এসেছিল। কথাটা এভাবে বললেই বোধ হয় ভাল হয় যে ওর প্রতি প্রেম আমার ঠিকই ছিল তবে কাজের ভেতর এই কুড়ি দিন প্রেম নিবেদনের কোনো চেষ্টাই আমি করিনি। ছোট্ট খাবার ঘরের টেবিলের পাশে আমরা বসেছিলাম। লীডার পরনে ছিল সুন্দর সাদারঙের একটা সান্ধ্য পোশাক। গলায়, আঙ্গুলে আর কানে বড় বড় দামী জড়োয়ার গয়না পরেছিল ও। ওর সুন্দর মুখ আর এণ্টোনিওর বানিয়ে-দেওয়া কুঞ্চিত কেশদামের ওপর, টেবিল ল্যাম্পের স্নিগ্ধ মৃদু আলো পড়েছিল। ওর অযত্নবিন্যস্ত লম্বা চুলের বেষ্টনীর মধ্যে যে মুখখানি দেখতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম তার বদলে ওর মুখে একটা আবেগপ্রবণ অল্পবয়সী মুখের ছায়া দেখলাম আজ। ঢেউ খেলানো চুলের সান্নিধ্যে বড় বড় নীল চোখের তির্যক চাউনি, বিস্ফারিত নাসা আর বিস্তৃত মুখমণ্ডলের হাস্যরেখা যেন আরও বেশী স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে। কী যেন হারিয়ে ওর মূর্তি আজ প্রাচীন গ্রীকদেশীয় অর্ধমানব-অর্ধপশুর রূপ নিয়েছে। ওর দিকে তাকালেই পুরোনো দিনের গ্রাকভাস্কর্য মূর্তির কথা মনে আসে; যার চোখেমুখে একই কালে দ্ব্যর্থক বিদ্রূপের চিত্র আর হিব্রু দেশীয় ছাগলের মুখাংশ দেখা যায়। ওর এই রূপটিকে বৈশিষ্ট্য দেওয়ার জন্যই বোধ হয় এণ্টোনিও সম্পর্কিত ঘটনা যে দিন ঘটে সে দিনের মত সোনালী চুলের ওপর একগুচ্ছ লাল ফুল গুঁজে দিয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়েই বললাম, 'বুঝলে এণ্টোনিও তোমার চুলটিকে যে-

ভাবে বিন্যস্ত করেছে এতে কিন্তু তোমাকে বেশ মানিয়েছে। ব্যাপারটা আজই আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছি।' নাপিতটির নাম শোনা মাত্রই ও একটু যেন চমকে উঠে চোখ নামালো। ও তখন একটা সুরাপাত্রের মস্তবড় স্ফটিকের ছিপিটা খুলবার চেষ্টা করছিল। ওর চুনির মত লাল ছুঁচল নখগুলোর মাঝখানে ছিপিটার পলগুলোর ওপর আলো পড়ে ওটাকে একটা খুব বড় হীরের মত দেখাচ্ছিল। ও আস্তে আস্তে বলে উঠল, 'চুলটাকে এভাবে সাজানোর পেছনে এন্টোনিওর কোনো অবদান নেই। ওটা নিতান্তই নিজস্ব। ও যা করেছে তা হচ্ছে আমার নির্দেশ পালন করা, তাও ত্রুটিপূর্ণভাবে।'

'এ ধরনের কেশবিন্যাসের চিন্তা তোমার মাথায় এলো কী করে?'

'আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন এইভাবেই চুল সাজিয়ে নিতাম। চুলের এই ভাঁজগুলো অল্পবয়সী আর...' একটু থেমে মৃদু হেসে বাক্যটি শেষ করল সে, 'আমার মত মাঝবয়সী মেয়েদের বেশ মানায়।'

'মাঝারি বয়সী, মানে? বোকার মত কথা বোলোনা কিন্তু! দেখ লীডা ঐ ফুলগুলোতে কিন্তু তোমাকে সুন্দর মানায়।'

এমন সময় পরিচারিকা ঘরে এল। আমরাও নীরবে খেতে শুরু করলাম। ও চলে গেলে আমি আমার ছুরি কাঁটা রেখে দিয়ে বললাম, 'তোমাকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে; বা বলা যায় তুমি একই মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তোমাকে দেখছি।' কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলাম আমি, মৃদুস্বরে বললাম, 'তুমি সত্যিই বড় সুন্দর। মাঝে মাঝে এ কথা হয়তো ভুলে যাই কিন্তু যখনই এ মুহূর্ত ফিরে আসে তখনই তোমাকে যে কত ভালবাসি তা গভীরভাবে বুঝতে পারি।'

ও নীরবে খাচ্ছিল। আমার কথায় অবজ্ঞার কোনো ভাবই দেখা গেল না ওর মুখে বরং আনত চোখের পাতায় আর কম্পিত নাসারন্ধ্রে একটু আত্মতৃপ্তির আভাসই পাওয়া গেল। আমি জানতাম

ওর পছন্দমত প্রশস্তি গ্রহণ করার পদ্ধতিই হল ঐ রকম। প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ওর হাতে হাত রেখে মৃদু গলায় বললাম, 'আমায় একটা চুমু দাও লীডা।'

ও নীরবে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো। ওর দৃষ্টিতে বক্রতা ছিল না, ছিল বরং সারল্যেরই ছায়া। প্রশ্ন করল, 'তোমার কাজ শেষ হয়েছে, তাহলে।'

সত্য গোপন করে উত্তর দিলাম, 'না শেষ হয় নি। কিন্তু ব্যাপার কি জান? তোমার দিকে তাকালে তোমাকে ভাল না বাসা বা চুমু না খাওয়ার কথা আমি একেবারেই ভাবতে পারি নে। চুলোয় যাকগে কাজ!'

কথায় কথায় আমি ওকে আমার দিকে আকর্ষণ করলাম। অল্প একটু বাধা দিয়ে ও আমার দিকে ঝুঁকে প্রণয়স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি একটি আস্ত পাগল।' তারপর ও হঠাৎ আমার দিকে ফিরে প্রচণ্ড আবেগে চুম্বন করল। এরপর চলল গ্রহণ-প্রতিগ্রহণের খেলা। স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের কাণ্ড দেখে মনে হতে পারে যে আমরা প্রেমের ক্ষেত্রে একেবারে নবাগত আর আগ্রহের আতিশয্যে ও ভয়ে আমরা আমাদের যথার্থ আনন্দকে মাটি করে ফেলছি। আমার তো মনে হল আমি ওর ওষ্ঠ থেকে চুম্বনের পাপড়িগুলো ছিনিয়ে ছিনিয়ে আনছি। আমি যেন আমার শৈশবে ফিরে গেছি, আর স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ গৃহভৃত্যের উপস্থিতির পরিবর্তে কঠোর প্রকৃতি মায়ের উপস্থিতির ভয়ে অত্যন্ত চঞ্চল। গৃহভৃত্য হয়তো একটু বিব্রতবোধ করলেও সহানুভূতির সঙ্গে সবদিক বিচার করে দেখত। আমরা আমাদের আকস্মিক এই প্রীতিপর্ব শেষ করে আবার শান্ত হয়ে বসলাম। আমি একটু ক্লান্ত হলেও একেবারে শান্ত ছেলেমেয়েদের মত চুপ করে বসে রইলাম। পরিচারিকা কিন্তু এখনও এল না, তাই নিজের দিকে আর ওর দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেল। ও যেন একটু সন্দেহ করেই প্রশ্ন করল, 'হাসলে যে?'

'না না, তোমাকে দেখে হাসছি না লীডা, আমি আমার নিজের সুখেই হাসছি।'

নীচের দিকে মুখ করে খেতে খেতে ও জানতে চাইল, 'কেন, এত সুখ কিসের?'

কোনো কথা গোপন না করে সরলভাবেই এবার বলে বসলাম, 'এত দিনের কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে, যা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে দুর্লভ, তা আমার করতলগত।'

'কোন্ কামনাটি তোমার পূর্ণ হল?'

উত্তরে বললাম, 'বছরের পর বছর মনে মনে একটি নারীকে শুধু ভালবাসতে চেয়েছি আর প্রতিদানে তার ভালবাসাও পেতে চেয়েছি। এখন আমি তোমাকে ভালবাসতে পেরেছি আর যদ্দূর মনে হয় তোমার ভালবাসাও পেয়েছি। দীর্ঘকাল ধরে ভেবেছি একটা অক্ষয় প্রাণবন্ত আর কাব্যধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করব, সে কামনাও আমার পূর্ণ হয়েছে—একটি সুন্দর কাহিনী রচনা করতে পেরেছি আমি। তাহলে দেখ, আমার দুটো কামনাই পূর্ণ হয়েছে এখন।'

লেখা যে শেষ হয়েছে এ কথা স্ত্রীকে জানাবো না ভেবে রেখে-ছিলাম। কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে কথাটি গোপন রাখতে পারলাম-না। আমি জানতাম যে ও আমাকে খুব ভালবাসে, তবু লীডার ওপর আমার এই সংবাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি আনন্দে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। 'তুমি শেষ করে ফেলেছ?' আনন্দে যেন ফেটে পড়ল লীডা, 'শেষ করে ফেলেছ লেখা?' ওর কথায় যেন আনন্দ ঝরে পড়ল, আর তার মধুর সুর ঝংকৃত হল আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে। ও বলে চলল, 'সত্যি সিলভিও, এ কথাও তুমি আগে আমায় বল নি?'

'ঠিক শেষ করেছি বলতে যা বোঝায় তা হয় নি বলেই সংবাদটি তোমাকে দিতে চাইছিলাম না। এখন ওটা টাইপ করতে হবে। পাণ্ডুলিপিটি টাইপ না করা পর্যন্ত ঠিক শেষ করেছি বলতে পারিনে।'

'ওতে কিচ্ছু যায় আসে না'—সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দের খেই টেনে চলল লীডা, 'এ একটা স্মরণীয় মুহূর্ত আমার কাছে ; লেখাটা সম্পূর্ণ হয়েছে এইটেই বড় কথা। এস আমরা বইটির সাফল্য কামনা করে তার স্বাস্থ্যপান করি।'

ওর স্নেহপ্রবণ মধুর আচরণ আর সুন্দর উজ্জ্বল নীল চোখ-দুটি যেন আমার প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আবেগকম্পিত হাতে আমি ওর পানপাত্রে একটু সুরা ঢেলে দিলাম। এর পর উভয়ে যখন উভয়ের পানপাত্র টেবিল থেকে একটু উঁচুতে তুলে ধরলাম তখন ও বলে উঠল, 'তোমার আর তোমার বইয়ের উদ্দেশ্যে—' এরপরই ও তার মুখটি আমার দিকে এগিয়ে ধরল আর সত্যি বলতে কি এইবার একটি সুদীর্ঘ আবেগতপ্ত চুম্বন ওর ওষ্ঠের ওপর আমি এঁকে দিলাম। এ দিকে পরিচারিকা ট্রেতে খাবার নিয়ে ঘরে এল আর আমরাও যে যার আসনে ঠিক হয়ে বসলাম।

আমার স্ত্রী বিরক্তিকর সামাজিক পরিবেশগুলিকে কী ভাবে সহজ স্বাভাবিকতার মাধুর্য দিয়ে মানিয়ে নিতে হয় তা জানত। সেই ধরনে ও পরিচারিকাটিকে ডেকে বলল, 'এস অ্যানা, আজ আমাদের একটি স্মরণীয় দিন, এক পাত্র সুরা তোমারও পান করা উচিত। সিলভিও, দাও না ওর পাত্রে একটু ঢেলে। নাও, সিনর সিলভিওর স্বাস্থ্যপান কর অ্যানা।' ট্রেটি একপাশে রেখে দিয়ে পানপাত্রটি তুলে নিল অ্যানা। তারপর আড়ষ্টভঙ্গিতে পাত্রটি শূন্যে তুলে ধরে, 'হ্যাঁ, তা করতে হবে বৈকি, স্বাস্থ্যপান তাহলে করতেই হবে।'

আবার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের খাওয়া দাওয়া শুরু হল আর আমার স্ত্রী প্রশ্ন করে চলল, 'তাহলে, এবার নিশ্চয় তুমি সত্যি একটা ভাল কাজ করেছ, কী বল ?'

'আমারতো মনে হয় তাই। তাছাড়া অন্যে যাই ভাবুক আমি অন্তত এ কথা নিশ্চয় ভাবতে পারি কারণ আমি একজন সমালোচকও বটে।'

লীডা তার হাতটি আমার হাতের উপর রেখে নীরবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ। এবার সে বলে উঠল, 'সত্যি আমি কি যে খুশি হয়েছি সিলভিও।' আমি ওর হাতটি তুলে পরমস্নেহে চুম্বন করলাম। আমার কাজ শেষ হওয়ার খবরটিকে ও যেভাবে অভিনন্দিত করল তাতে তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আর অন্ত রইল না। ওর মনের মধ্যে আমার জন্য যে অক্ষয় প্রেম সঞ্চিত ছিল, কষ্টিপাথরে ছুঁইয়ে তারই মূল্যটি যেন সে আমার সামনে আর একবার তুলে ধরল। আনন্দবিহ্বলতায় আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে এই স্বীকৃতি আমার সাহিত্যজ্ঞানশূন্য স্ত্রীর কাছ থেকে লাভ করছি না, এ যেন আসছে কোনো বিচক্ষণ সমালোচকেরই কাছ থেকে। এ অনুভূতি যে খুব নির্ভরযোগ্য নয় তা আমি ভুলি নি। তবু আমার মনে হয়, এমনকি যাঁরা বিখ্যাত লেখক তাঁদেরও লেখকজীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। সেই আশাপূর্ণ জীবনের ভীরু অধ্যায়ে অভিজ্ঞতর সহকর্মীর মতামত তার নিশ্চয় অন্তত একবার হলেও প্রয়োজন হয়। এই আনন্দময় পরিবেশের দ্বারা এমনই এক আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম যে সহসা আবিষ্কার করলাম নিজের অজ্ঞাতসারেই খাওয়া শেষ করেছি, টেবিল ছেড়ে উঠেছি, হেঁটে বসবার ঘরে গেছি এবং আমার স্ত্রী আমার সামনে দাঁড়িয়ে কফি ঢালছে।

উজ্জ্বল বিদ্যুতের ক্ষণিকস্ফুরণে যেমন করে মানুষের দৃষ্টিশক্তিতে ধাঁধা লাগে, সামনের মানুষকেও চিনতে পারে না সে, সেই রাত্রের কোনো খুঁটিনাটি ঘটনাও তেমনি আর আমার মনে পড়ে না। যতটুকু মনে পড়ে তা হল, আনন্দের প্রাবল্যে আমি বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম আর প্রগাঢ় আবেগের সঙ্গে তার আর আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এরপর ওকে আর আমাকে নিয়ে যে কাহিনী রচনা করেছি, সেই আলোচনা করতে গিয়ে জানালাম আমাদের বিবাহকে কেন্দ্র করে কীভাবে ঘটনা সংস্থান করেছি,

কোথায় কোথায় কী বাদ দিয়েছি আর কোথায় কী কী ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। [আমার বইয়ের প্রসঙ্গে বহু বিখ্যাত বই থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম আমি।] তা ছাড়া নিজের বক্তব্যকে প্রাচীন নজীর টেনে এনে ঐতিহ্যের মর্যাদা দিয়েছিলাম। এসব বক্তব্যের মাঝখানে আমি সম্পূর্ণ অন্য কথা আর কাহিনীরও অবতারণা করছিলাম। সামনে একটা সদ্য প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহ পড়েছিল। শেষে ওই বইটি টেনে এনে কয়েকটা আধুনিক কবিতা ওকে পড়ে শোনালাম। আমার স্ত্রী সামনের সোফায় পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট টানছিল আর আমার পড়া শুনছিল। গল্প লেখা শেষ করেছি এ কথা শোনানোর সময় ওর মধ্যে প্রেমের যে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লক্ষ্য করেছিলাম তেমনি অপরিবর্তিত মনোভাব নিয়ে আমার পড়া শুনে চলেছিল সে। শহরতলির সেই বাড়িতে, উনিশ শতকের একটি বসবার ঘরে সেদিন হাজারটা পুরোনো ধাঁচের আসবাবপত্রের মাঝখানে বসে আমরা, বিশেষ করে আমি নিজে, যে একাত্ম প্রণয়ের আস্বাদ লাভ করেছিলাম তা অতুলনীয়। আর ঠিক যে মুহূর্তে আমি সেই বইটি বন্ধ করলাম, ঘরের আলোটিও গেল নিভে।

গ্রামের ঐসব অঞ্চলে বিজলীবাতির হঠাৎ নিভে যাওয়া তেমন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। ওই সময় জলপাই ফল সংগ্রহ চলছিল আর ওই ফল মাড়াইয়ের কারখানায় একটু বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহ করছিলেন কর্তৃপক্ষ। অন্ধকার ঘরের জানালায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ওখান থেকে বাইরের পথটি দেখা যেত। বাইরে তখন চন্দ্রালোকিত রাত্রি, নৈশাকাশের পটভূমিতে কাল কাল গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ও দিকে ফিরে দেখি, শহর যে দিকে সেই পাহাড়ের পেছন থেকে চাঁদ উঠে আসছে, একটুমাত্র অংশ দেখলাম আগে। তারপর ধীরে ধীরে গোটা চাঁদটি একটি বিরাট রজতশুভ্র গোলকের মত উজ্জ্বল আকাশে ফুটে উঠল যেন। ওর আলো এসে পড়ল শহরের বাদামী ঘরবাড়ির দেওয়ালগুলোর ওপর। সারা শহরটার

ওপর যেন পরম শান্তি আর নির্জনতার স্নিগ্ধপ্রলেপ মাখিয়ে দিল চাঁদের আলোয়। যে দিন পাহাড়ের চুড়োয় শহরটি গড়ে উঠেছিল সে দিন তার পেছনে ছিল তাকে সুরক্ষিত রাখার কল্পনা। আজ আমার মনে হল আকাশে সদাজাগ্রত অভিভাবকত্বের আলোকে শহরটি তার নির্ভয় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। আকাশের ঐ চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলাম। ঠিক এমনি সময় আমার পেছন থেকে আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ও এতক্ষণ সোফায় বসেছিল। ওখান থেকেই ওকে বলতে শুনলাম, 'শুতে যাওয়ার সময় হয় নি? আমার তো মনে হয় বেশ রাত হয়ে গেছে, তাই না?'

ওর কথায় শুতে যাওয়ার সময়টুকু স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া হয়তো আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমার মনের সেই উল্লসিত অবস্থায় মনে হল ঐ কথাকটির মধ্যে একটা সস্নেহ আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে বললাম, 'বাইরে কত সুন্দর চাঁদ দেখ। আমরা একটু বেড়িয়ে আসব না লীডা?' কোনো কথা না বলে ও অন্ধকার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমরা একত্রে কাঁকর-বিছানো পথ ধরে বাড়ির সামনে হেঁটে চললাম।

চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। গরমের দিনে যে পোকামাকড়গুলো বাইরে থাকে সেগুলোও শরৎকালের এমনি রাত্রে সামনের বছর না আসা পর্যন্ত গর্তের মধ্যে গিয়ে সেঁধোয়। বাড়ির সামনে প্লাস্টারে তৈরী যে দুটো কুকুর বসানো ছিল সেগুলোও যেন নীরবতার অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বসেছিল। গাছের তলা দিয়ে পথ ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। পথের ছায়াঘন অংশে এসে হাত বাড়িয়ে আমি ওর কোমরটি জড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে হল ও যেন জানত কোনো রকম ভাবপ্রবণতা না দেখিয়েই আমি এভাবে ওর কটিদেশ পরমস্নেহে অথচ প্রত্যক্ষ ঔদাসীন্যে জড়িয়ে ধরব। এর জন্য ও বেশ প্রস্তুতই ছিল। দু সারি গাছের মাঝখান দিয়ে চললাম

আমরা। গাছের ঘনপাতার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়ছিল। গেটের পাশে না গিয়ে একটু পরেই আমরা অন্য পথে ফিরে চললাম। ও দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নিস্তব্ধ চন্দ্রালোকের মৌন সৌন্দর্য চোখে পড়ল। সামনের প্রান্তর ছাড়িয়ে দূরের রজত-শুভ্র শূন্যতা আর একটি খোলা জায়গার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার স্ত্রী আমার ওপর একটু হেলান দিয়েই হাঁটছিল আর আমি আমার হাত দিয়ে ওর কোমল কটিদেশের স্পর্শ অনুভব করছিলাম। চলতে চলতে আমরা পার্কের শেষে এসে শেষ গাছটির তলায় দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওখান থেকে দূরের পাহাড়ে খামার বাড়িগুলোর চন্দ্রালোকিত অংশগুলো কিছু কিছু দেখা যাচ্ছিল। খোলা জায়গায় একটা টিলার ওপর ছিল ফসল-মাড়ানোর মঞ্চ। খামার বাড়ির নীচে ঐ মঞ্চটার কাছে তিনটে খড়ের গাদাও ছিল। ওর ওপাশে আবার বিস্তীর্ণ প্রান্তর দূরের খামারবাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে।

আমরা আবার এগিয়ে চললাম ধীরে ধীরে। এপাশের খামার-বাড়ি পেরিয়ে পাহাড়ের তৃণাস্তীর্ণ ঢালু অংশ ছাড়িয়ে সেই ফসল-মাড়ানো মঞ্চের কাছে গিয়ে পড়লাম। খড়ের স্তূপগুলোকে এবারে বেশ দেখতে পেলাম। ওগুলোর মধ্যে একটা একেবারে নতুন চকচকে হলদে রঙের, দ্বিতীয়টা একটু পুরোনো বাদামী রঙের আর তৃতীয়টা মেশানো খড়ের ছোট স্তূপ, পাশে দাঁড়করানো বাঁকা খুঁটির গায়ে ওটাকে নৌকোর হালের মত দেখাচ্ছিল। ঘন রঙের প্রান্তরের পটভূমিতে চন্দ্রালোকিত এই খড়ের স্তূপগুলিকে আর সব দৃশ্য থেকে যেন একটা বিচ্ছিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিত্র বলে মনে হচ্ছিল। দেখতে দেখতে মনে হল ওগুলোকে এমনি সাধারণভাবে ফেলে রাখা হয়-নি। ওর সত্যিকার প্রকৃতি ভুলে গিয়ে যে কোনো মানুষ এখন ওর মধ্যে এক অন্তর্নিহিত রহস্যেরই যেন সন্ধান পাবে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার তো কেবলই ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের প্রান্তরে ড্রুইডদের

(যারা ফাঁকা জায়গায় ওক গাছের তলায় উপাসনা করত) ফেলে-যাওয়া বড় বড় পাথরগুলোর কথা মনে হতে লাগল। লীডাকে বললাম, চাঁদের আলোয় খড়ের স্তূপগুলো দেখে ব্রিটানীর পাথুরে টেবিলগুলোকে আমার মনে পড়ছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই সাদাসিধে পাথর দিয়ে যে টেবিলের মত বেদী তৈরি হত আর তাকে ঘিরে সে যুগের মন্দিরগুলোতে যে পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ চলত তারই কিছুটা ব্যাখ্যা করলাম ওর কাছে। কেন জানি নে হঠাৎ আমার প্রবল ইচ্ছা হল যে চাঁদের আলোয় ফসল-মাড়ানো সেই মঞ্চের ওপর উঠে বিছানো খড়ের ওপর আমরা পরস্পরকে প্রেম নিবেদন করি। এই যথাযোগ্য পরিবেশে, জ্যোৎস্নাস্নাত প্রান্তরের মধ্যে আমার সাহিত্য-কীর্তির শুভ সমাপ্তি আর আমাদের দাম্পত্যপ্রণয়ের মধুর জীবনে প্রত্যাবর্তনের সমারোহপূর্ণ নিদর্শনটি বোধ হয় আমরা এইভাবেই স্মরণীয় করে রাখতে পারি। আমার এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে কোনো রকম সাহিত্যসঞ্চিত স্মৃতি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে নি তা বলতে পারি না। তাছাড়া আমার মধ্যেও ছিল সাহিত্য, তাই আমি যে আমার মধ্যেকার সাহিত্যিক কল্পনাকে গভীর আর অকৃত্রিম আবেগে অনুরঞ্জিত করে তুলতে চাইব, এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। লীডাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। উন্মুক্ত চন্দ্রালোকিত প্রান্তরের নির্জন সান্নিধ্যে তাকে ঘনিষ্ঠ করে আমার যে পাওয়ার কামনা এ বোধহয় খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এগার

বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দৃশ্যটুকু সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য ফসলমাড়ানো মঞ্চের ওপর যে আমি যেতে চাই সে কথা লীডাকে বললাম। তখনও সে আমার সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পেছল ঘাসের ওপর দিয়ে অতি কষ্টে হাত ধরাধরি করে আমরা ওপরে উঠলাম। ওপরে গিয়ে আমরা উভয়েই একটু সময় স্থির নীরবতায় সেই বিশাল দৃশ্যটি উপভোগ করতে শুরু করলাম। যতদূর দৃষ্টি যায় চাঁদের উজ্জ্বল কিরণে সব কিছুকে এক অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত দেখলাম আমরা। ফলের গাছ, আঙ্গুরের ক্ষেত এমন কি দূরের ঝোপ-গুলো পর্যন্ত নিখুঁত সুন্দর বলে মনে হল। কোথাও কোথাও কোনো খামারবাড়ি চাঁদের শুভ্র আলোয় স্নান করে রমণীয় রূপ ধারণ করেছিল। পৃথিবী আর প্রশান্ত আকাশের মাঝখানে দূর দিকচক্রবালে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল কাল রঙের একসারি পাহাড়। ঠিক এমনি সময় প্রান্তরের ও পাশ দিয়ে আমার দৃষ্টির বাইরে বোধহয় একটা ট্রেন চলে গেল। ওর সেই সাময়িক শব্দ থেমে যেতে নিদ্রামগ্ন প্রান্তরের বিস্তীর্ণ নীরবতা যেন আরও বহুগুণে বেড়ে গেল।

প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে লীডা যেন সেই গভীর নীরবতার অর্থ খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিল। ওর কটিদেশ বেষ্টন করে নিয়ে রাত্রির রূপ বিশ্লেষণের ভঙ্গিতে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে নানা কথা মৃদুকণ্ঠে বলে যেতে লাগলাম। কথার মাঝখানে এক সময় ওকে পেছনে ফিরিয়ে নিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় শহরের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমরা একটু একটু এগিয়ে খড়ের গাদাগুলোর পাশে গিয়ে পড়লাম। তলায় কিছু খড় বিছিয়ে পড়েছিল। মনে হয় সকালবেলায় চাষিদের

ছেলে মেয়েরা ওখানে খেলা করে গেছে। হঠাৎ আমি ওকে একান্ত কাছে টেনে এনে বললাম, 'আচ্ছা আমাদের ঘরের নিভৃততম কক্ষের থেকে এ জায়গাটা অনেক বেশী কাম্য নয় কি লীডা?' আমি ওকে খড়-বিছানো মঞ্চের ওপর বসে পড়তে ইঙ্গিত করলাম।

প্রলুব্ধ-বিস্ফারিত নীল চোখগুলো ও আমার মুখের কাছে তুলে ধরে আস্তে আস্তে বলল 'না, না, খড়গুলো বড্ড নোংরা। আমাদের গায়ে ফুটবে এগুলো, আর আমার নতুন ফ্রকটা একেবারে নোংরা হয়ে যাবে।'

'ফ্রকটার ভাবনাই বড় লীডা?'

এমনি আলোচনার মুহূর্তে ও এক অপ্রত্যাশিত প্রণয় মধুর ভঙ্গিতে হেসে উঠে বলল, 'তোমার লেখার কাজ তো শেষ হয় নি এখনও। যে দিন সত্যি সত্যি তোমার কাজ শেষ হয়ে যাবে, সে-দিনই রাত্রে আমরা এখানে চলে আসব আর এমনি আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে এইখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপভোগ করব। কেমন, খুশি তো?'

'না না, সে হয় না। সে দিন মোটেই চাঁদ থাকবে না···এই রাতটি কত সুন্দর!'

তখনও যেন তার কিছু সঙ্কোচ রয়েছে এমনি ভাবে অত্যন্ত কোমল অনুনয়ের ভঙ্গিতে ও বলে উঠল, 'আজ আমাকে যেতে দাও, সিলভিও' কথার শেষ হতে না হতেই ও হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে দৌড়ে নেমে গেল। একমুহূর্ত আগে ওর চোখের মধ্যে কামনার যে দীপ্তি দেখেছিলাম, এখন ওর শিশুসুলভ হাসির মধ্যেও সেই স্নেহভীরু কামনার সুর শুনতে পেলাম আমি। প্রথমটা খুব খারাপ লেগেছিল আমার। কিন্তু এখন মনে হল যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে আমার। ওর পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে মনে হল ঘটনার এই পরিণতিটি, এই মৃদু প্রত্যাখ্যান, আর একটু হাসিই হয়েছে অত্যন্ত স্বাভাবিক। ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর পার্কের ভেতর দিয়ে দৌড়ে

চলেছিল। ওকে কিন্তু আমি সহজেই ধরে বন্দী করে ফেললাম। ওর হাসির প্রভাবে আমার সমস্ত কামনা বাসনা পূর্ণতা লাভ করেছিল। একটি চুম্বনের পর ওর হাতটি শক্ত করে ধরে নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আবার আমরা একত্রে হেঁটে চললাম। চাঁদের আলোয় আমাদের সামনে দুটো ছায়া পড়েছিল, পৃথক পৃথক হলেও হাতে হাত ছিল জড়ানো। ফসল-মাড়ানো মঞ্চের ওপর থেকে আমার আলিঙ্গন এড়িয়ে এইভাবে পালিয়ে এসে ও যেন অনেক বেশি ভালবাসার পরিচয় দিয়েছে বলেই মনে হল। ধীরে ধীরে হেঁটে আমরা আবার ঘরের সামনে এসে পড়লাম। ইতিমধ্যে বিজলীবাতিগুলো আবার জ্বলে উঠে ঘরের মধ্যে যেতে যেন আমাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছিল। ও যখন আমার সামনে সামনে ধীর সুন্দর ভঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল তখন ওর দেহের ছন্দ যেন মূর্ত হয়ে উঠছিল। সেদিনের মত সুন্দর ওকে আর আমি বোধহয় কোনোদিনই দেখি নি। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে লীডা আবার মিষ্টি হাসির চাহনি হেসে বলল, 'তাহলে তোমার কাজ শেষ হক, কেমন?......তারপর এক রাতে আমরা উভয়ে ঐখানে চলে যাব।' ওর একটা হাত আমি স্পর্শ করলাম। পরম তৃপ্তিতে কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তারপর সোজা আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম ; আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকালে উঠে মনে হল আমার সেই আত্মতৃপ্তির ভাবটি না কমে গিয়ে বরং বেশ বেড়ে উঠেছে। এঞ্জেলোর এক্কায় চেপে যখন আমি শহরে রওনা হলাম, আমার স্ত্রী তখনও ঘুমোচ্ছিল। এঞ্জেলো বুঝি ভাবল যে গাঁয়ের খবরাখবর আমাকে জানানো ওর কর্তব্য। ও বক বক করে চলল সারাক্ষণ আর আমি আমার চিন্তাভাবনা আর অনুভূতির মধ্যে ডুবে রইলাম। সকালের উজ্জ্বল আলোর ভেতর দিয়ে এক্কাটা পাঁচিল পেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল সবকিছুতেই শরতের একটি

কোমল মাধুর্য মাখা রয়েছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল তীব্র গ্রীষ্মের সৌন্দর্য থেকে এর পার্থক্য যেন স্পষ্টই ধরা পড়ে। গ্রাম্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে কিছুটা মলিনতা আর ক্লান্তিও যেন আমি দেখতে পেলাম। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রতিটি বস্তুর প্রতিটি বর্ণের রূপ গভীরভাবে উপভোগ করতে লাগলাম। ঐ যে লাল রঙের একটা পাতা দ্রাক্ষালতা থেকে বাতাসের স্পর্শে ঝরে পড়েছে, ওদিকে পুরোনো ধূসর বাদামী আর সবুজ রঙের দেওয়ালের গায়ে আলোছায়ার কি বিচিত্র জাল বোনা; কি সুন্দর ছোট পাখি! ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে উড়ে গিয়ে বসে পড়ল ওপারে মাটির ঢিবিটার ওপর। খামারবাড়ির সাদা দেওয়ালের ওপর মরচে পড়ার মত কেমন এক ধরনের রঙ। ছোট গীর্জাটা ঠিক যেন গোলাবাড়ির মত দেখতে। ওর জল-বৃষ্টি-খাওয়া ছাদের টাইলে কেমন সোনার মত হলদে রঙের শ্যাওলা জমেছে। পথের ধারে ওক গাছটার পাতাগুলো কেমন ঘন হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঝুলছে হাল্কা সবুজ রঙের বড় বড় ফলগুলো।

এই ধরনের ছোটখাট দৃশ্যগুলো আজ আমার মনটাকে এক আশ্চর্য খুশির দোলা দিয়ে গেল। বুঝতে পারলাম আমার মনের অব্যক্ত আনন্দের ছোঁয়া লেগে এসব তুচ্ছ জিনিস প্রীতিপ্রদ আর সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সমতল প্রান্তর ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এক্কাটি আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। জোরে হেঁটে গেলে যেমন যাওয়া যায়, এক্কাটার গতি প্রায় সে রকমই ছিল। উজ্জ্বল সূর্যালোকে পাহাড়ের মাথার ওপরকার শহরের খাড়া দেয়ালগুলো এবার আমার চোখে পড়ল। প্রভাতের এই স্বল্প ভ্রমণের শেষে আকাঙ্ক্ষিত শহরটি দেখতে পেয়ে আমার মন প্রসন্ন—আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল সারা-জীবন যে লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অনির্বাণ কামনা অন্তরে পোষণ করে এসেছি, আজ সেখানেই পৌঁছতে চলেছি আমি। গাড়িটি যতই এগোতে লাগল, যতই আমি স্পষ্টতর ভাবে শহরের দেওয়ালগুলোকে

দেখতে পেলাম ততই আমার মনে হতে লাগল আমি যেন কতকগুলো অসংলগ্ন চিন্তা আর অনুভূতিসম্পন্ন একজন সাধারণ মানুষ মাত্র নই। ইতিহাস তার পাতায় পাতায় বীরপুরুষদের যে সম্মান লিপিবদ্ধ করে রেখেছে তেমনি পূর্ব-নির্ধারিত রহস্যময় ভাস্বর আবরণে আবৃত হয়ে সময়ের এক বিশেষ অধ্যায়ে আমি যেন সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁরা একদিন অসীম সান্ত্বনার বাণী বহন করে এনেছিলেন, যাঁদের প্রতি আমিও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল তাঁদের মতই সেই একই প্রভাতসূর্যের কিরণোজ্জ্বল পথে আমি আজ অগ্রসর হয়ে চলেছি। এই বিস্ময়কর চেতনার মধ্যে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে একদিন না একদিন আমিও তাঁদেরই একজন হয়ে দাঁড়াব। এই বিশেষ মুহূর্তে আমি যেন এক পরম সত্যেরই সন্ধান পেলাম। মনে হল শাশ্বত মহিমার ক্ষেত্রে আমার প্রতিষ্ঠা অনিবার্য। পাহাড়ের ঋজুবন্ধুর পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছিল। তারই সঙ্গে সঙ্গে আমিও উচ্চারণ করছিলাম মৃদুকণ্ঠে 'উনিশ শ' সাঁইত্রিশ সালের সাতাশে অক্টোবর।' বার বার এই কথা কটিকে নিপুণভাবে ভেঙে ভেঙে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে আমি অনুভব করলাম যে ঐ মায়াময় তারিখটির মধ্যেই পূর্বনির্ধারিত কোনো একটা ঘটনার আভাস সঞ্চিত রয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা শহরের প্রধান ফটকে এসে পড়েছিলাম। ফটকের স্থাপত্যশিল্পটি প্রাচীন ইটালীর এক বিশেষ ধারায় গঠিত বলে মনে হল। ওর ওপরে মধ্যযুগীয় হাল্কা গড়নের তোরণ শোভা পাচ্ছিল। যে কোনো জায়গার যে কোনো দিনের সকালবেলাকার মত পাহাড়ের চুড়োয় অবস্থিত এই শহরটির রৌদ্রালোকিত পথে কৃষকদের জিনিসপত্রের ঝুড়ি প্রভৃতি নিয়ে যাতায়াত করতে দেখলাম। একটু পরে দু সারি পুরোনো বাড়ির মাঝখানে খোয়া-বাঁধানো রাস্তায় আমার গাড়ি গিয়ে পৌছল। আমি যেন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়লাম। চৌমাথায় গিয়েই আমি এঞ্জেলোকে ছেড়ে দিলাম, বলে দিলাম সে যেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসে। কোর্সো ছাড়িয়ে এগিয়ে

চললাম আমি। যে দোকানে কাগজ কিনব ভেবে রেখেছিলাম সেটি খুঁজে বার করতে মোটেই বেগ পেতে হল না। কিন্তু টাইপকরার কাগজ পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে শেষে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে ভেবে কিছু ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে নিলাম। কাগজগুলো বগলদাবাই করে হাজির হলাম ওখানকার একটা কাফেতে। বড্ড সেকেলে ধরনের নোংরা কাফে ছিল ওটা। তাকের ওপর কয়েকটা বোতল বসানো। দেওয়ালের গা ঘেষে যে গদীআঁটা আসন সেখানে একটিও খদ্দের নেই। যাই হক এক গেলাস ভারমুথ পান করে আমি খবরকাগজের স্টলে চলে এলাম। এখানে কতকগুলো ছবিওয়ালা সাময়িক পত্রিকা আর হাসির বই নেড়েচেড়ে শেষ পর্যন্ত একখানা খবরকাগজ কিনে নিলাম। কাগজটি নিয়ে টাউনহলের সামনে একটা পাথরের বেদীতে বসলাম। দেখলাম একটু ওপরে বনেদীবংশের মর্যাদাসূচক প্রতীকচিহ্ন আঁকা রয়েছে আর পাশে রয়েছে ঘোড়া বেঁধে রাখার জন্য লোহার রিঙ। এঞ্জেলোকে এক ঘণ্টার পর আসতে বলা ঠিক হয় নি মনে হল। তবু ভাবলাম ওর কাজকর্ম শেষ করেই ও আসুক—ততক্ষণ অপেক্ষা করি। ও দিনটি বাজারের দিন ছিল না তাই সামনের মধ্যযুগীয় ঘরবাড়িঘেরা সঙ্কীর্ণ বেড়াবার জায়গায় কোনো লোক ছিল না। ওটায় তখন কিছু আলো আর কিছু ছায়া। ওখানেই গিয়ে বসলাম শেষে। পাশ দিয়ে খুব বেশি হলে দশ জন লোক গেল এল, তাদের প্রায় অর্ধেকই ধর্মযাজক। খবরকাগজ পড়তে পড়তে বুঝলাম দেরির জন্য আমি মোটেই বিচলিত হই নি। কাজ শেষ হয়েছে বটে তবু ঠিক সেদিনই টাইপ শুরু করার ইচ্ছা আমার ছিল-না। আমার মনের অবস্থা খুব শান্ত আর স্বাভাবিক ছিল। পাশের দোকানগুলোতে লোকজন কাজ করছে, কাগজ পড়ার পর এইগুলোই দেখতে লাগলাম। সূর্য ক্রমশই ওপরে উঠতে লাগল আর টাউন-হলের ছায়াও ক্রমশ ছোট হতে হতে বাঁধানো পাথরের তলায় গিয়ে পৌঁছল। কোথাও যেন হঠাৎ কনভেন্টের ঘণ্টা বেজে উঠল আর

তার সঙ্গে বড় গীর্জার গম্ভীর ঘণ্টাও। দুপুর হয়ে গিয়েছিল। শহরটি যেন জেগে উঠল তার আলস্য থেকে আর দলে দলে লোক বেড়াবার জায়গায় এসে জড় হতে লাগল। সারা পথ পেরিয়ে, কর্সো ছাড়িয়ে আমিও সেই সূর্যালোকিত সভাক্ষেত্রের দিকে চললাম। কেন জানি আমার ধারণা হল, এঞ্জেলোকে আমি ওখানেই পাব। আমার অনুমান ঠিকই। ওখানে কয়েকটি গ্রাম্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম এঞ্জেলোকে। আমরা দেরি না করেই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির দিকে।

হয়তো বা ক্লান্তির জন্যই, ফেরার পথে আমার চিন্তা একান্তই বাস্তব পথ অনুসরণ করে চলল, বইটা ছাপতে দেব কাকে, বাঁধাই কেমন হবে, কোন কোন সমালোচক এ বইর ওপর লিখবেন, কারা বইটা পছন্দ করবেন আর কারা করবেন না ; এমনি নানা কথা ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ লীডার কথা মনে এল। কেন জানিনা মনে হল ওকে পাওয়া আমার জীবনের পক্ষে একটা সৌভাগ্যেরই অধ্যায়। ওকে হারালে আমার যে বিরাট পরিবর্তন ঘটবে একথা ভাবতে গিয়ে এক নিদারুণ মর্মপীড়া অনুভব করলাম। মনে হল আমার হৃৎপিণ্ড থর থর করে কাঁপছে। হয়তো এখনই আমার শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। ওর সঙ্গে আমার জীবন যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে আর ওকে বাদ দিয়ে আমার জীবন যে অর্থহীন সে কথা বুঝতে বাকী রইল না। ওকে পেয়ে আনন্দ আর সৌভাগ্যগর্বে মাঝে মাঝে হয়তো ভেবেছি যে ওকে বাদ দিয়েও আমার জীবন সহজভাবেই চলতে পারবে। কিন্তু নিজেকে মনে মনে ওর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখলাম যে তেমন অবস্থায় বোধ হয় আমিই হব পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অসহায় আর হতভাগ্য ব্যক্তি। কেন জানিনা মনে হল এই বিচ্ছেদ একদিন না একদিন ঘনিয়ে আসবে আমার জীবনে। অবর্ণনীয় অবসাদে আমি একেবারে ভেঙে পড়লাম। বাইরে প্রচণ্ড সূর্য কিরণ সত্ত্বেও কী যেন এক শীতল স্পর্শে আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। আমি ক্রমশ কাতর হয়ে পড়লাম, চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে

পড়ল। ঘোড়ার গতিবেগ বাড়িয়ে দেবার জন্য হঠাৎ এঞ্জেলোর ওপর খিঁচিয়ে উঠলাম, 'এ ভাবে চললে সন্ধ্যের আগে কি আমরা বাড়ি পৌঁছতে পারব ?' ভাগ্যক্রমে ততক্ষণে আমরা সমতল ভূমিতে এসে পৌঁছেছিলাম আর ঘোড়াটাও বুঝতে পেরেছিল বোধহয়, যে ওর আস্তাবল কাছেই। সে তাই একটু যেন গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। পথের দিকে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চিন্তায় আর সেখানে ফিরে আমার লীডাকে কাছে পাওয়ার ভাবনায় অধীর হয়ে উঠলাম। খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে প্রথম বড় একটা রাস্তা, তারপর একটা পুল। ঐ পুলটি পেরিয়ে যে রাস্তা চলে গেছে সেটি আমাদের পার্কের দেয়ালে এসে পড়েছে, এর পরই আমাদের ফটক, কাঁকর-বাঁধানো রাস্তা আর বাড়ি। বাড়ির সামনে খোলা জায়গাটায় তখনও সূর্যের আলো ঝলমল করছিল। পথে যেভাবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তারপর একটি অভাবিত দৃশ্য আমাকে বিস্মিত করে দিল। দেখলাম ওপরের জানালার পাশে একটা হাল্কা রঙের পোশাক পরে, বই হাতে লীডা বসে আছে। মনে হল ও যেন বছরের পর বছর ওখানে আমার অপেক্ষায় বসে রয়েছে। ওর প্রতীক্ষারত সেই মূর্তি আমার ক্লান্ত মনটাকে একেবারে ভরে দিল। কাঁকর-বাঁধানো রাস্তায় গাড়ির শব্দ পেয়েই ও তক্ষুণি বেরিয়ে এল। গাড়ি থামতেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে ওকে সম্ভাষণ জানিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেলাম।

'বড্ড দেরি করে ফেলেছ,' পেছনে আসতে আসতে বলল লীডা, 'তোমার নাপিত অনেকক্ষণ এসেছে। ওপরে সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কটা বেজেছে ?'

'একটা বেজে গেছে কতক্ষণ।'

'এঞ্জেলোই দেরি করে দিল। এক্ষুণি কামিয়ে নিয়ে নেমে আসছি'। ও কোনো কথা না বলে বাগানে বেরিয়ে গেল আর আমিও ওপরে আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। ওখানে এন্টোনিও ক্ষুর

আর অন্যান্য জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে মাথা নুইয়ে সুপ্রভাত জানালে ও। আমি ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'তাড়াতাড়ি কর এণ্টোনিও। বড্ড দেরি হয়ে গেছে, যত তাড়াতাড়ি পার শেষ করে নাও।' কথাগুলো কোনো রকমে বলেই আমি আরাম চেয়ারটায় বসে পড়লাম।

এখন বেশ বুঝতে পারছি আমি ক্ষিদের চোটে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলা এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছু খাই নি। পেটে কিছু না থাকায় মাথা ঘুরছিল। ক্ষিদের জ্বালায় আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম। এণ্টোনিও যখন তার স্বাভাবিক মন্থর গতিতে আমার কাঁধের ওপর তোয়ালে জড়িয়ে দিচ্ছিল তখন যেন একটু চটেই বলে উঠলাম, 'তুমি কি তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারনা?' ভাবলাম, ওকে কি একটু তাড়াতাড়ি কাজ করতে বলিনি আমি? জাহান্নামে যাক লোকটা। ওর যে ধীর স্থির আচরণ আগে আমাকে খুশি করেছে আজ কিন্তু তাতেই আমার মন বিষিয়ে উঠল। একবার ওকে তাড়াতাড়ি কাজ করার কথা বলেছি, আর বলা যায় না, এ জন্যে আরও খারাপ লাগল আমার। ও যখন বুরুশে সাবান মাখিয়ে নিচ্ছিল আমি অসহিষ্ণু হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত গুনতে শুরু করে দিয়েছিলাম। একই সঙ্গে আমার ক্ষিদে আর অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলছিল।

বুরুশে সাবান মাখিয়ে নিয়ে ও আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল আমার মুখে সাবান মাখিয়ে দেবার জন্য। খদ্দেরের মুখের ওপর সাবানের ফেনার একটা বিরাট স্তর বানানোর ব্যাপারে এণ্টোনিওর দোসর ছিল না। কিন্তু ঐ দিন সকালে ও যতই মুখের ওপর বুরুশ চালাতে লাগল আমি ততই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম। এদিক থেকে ও দিকে বুরুশটা ফিরে গেলেই মনে হচ্ছিল এবার ওর সাবান মাখানো বুঝি শেষ হল। কিন্তু বুরুশটা ফিরে ফিরে আসা যাওয়া করতে লাগল আমার সমস্ত ধারণাকে বারবার মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেন জানিনে সেদিন মুখ সুদ্ধ সাবান মেখে আরাম চেয়ারে বসে থাকা

আমার পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। আবার এও মনে হচ্ছিল এণ্টোনিও আমাকে ঐ রকম অসম্ভব অবস্থায় ইচ্ছে করেই ফেলে রেখেছে।

এ সন্দেহটা পরক্ষণেই হাস্তকর মনে হল। মন থেকে ওটাকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিলাম। বুঝলাম ক্ষিদের জ্বালায় আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। ওদিকে যখন অনন্তকাল ধরে আমার মুখের ওপর বুরুশ চলতে লাগল তখন চটে গিয়ে বলে উঠলাম, 'তোমাকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বলেছিলাম। তোমার সাবান মাখানোই শেষ হল না।' দেখলাম বিস্মিত গোল গোল চোখ দিয়ে এণ্টোনিও আমাকে একবার দেখে নিয়ে সাবান-মাখানো বুরুশটা রেখে দিলে আর ক্ষুরটা তুলে নিলে।

কিন্তু আমার কথা বলার পরেও বুরুশের একটা টান আমার মুখের ওপর বুলিয়ে নিতে ও ছাড়েনি। এটিকে ওর দিক থেকে আমার প্রতি অবাধ্যতা,—এমন কি একটু ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বলেই মনে হল। আমি বেশ বিরক্ত হয়ে উঠলাম।

কিছুক্ষণ ক্ষুরটায় শান দিয়ে নিয়ে ও আমাকে কামাতে শুরু করল। খুব দক্ষতার সঙ্গে ও আমার ডান গালের ফেনাগুলো সাফ করে নিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এইভাবে কাজ করতে গিয়ে ও তার শরীরটাকে আমার হাতের ওপর চেপে ধরল। যে দিন থেকে ও আমাকে কামাতে আসছে তার মধ্যে এই প্রথম আমার দেহের ওপর ওর দেহের নিম্নাংশের চাপ অনুভব করলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল লীডার অভিযোগগুলো। এতে আর সন্দেহ রইল না যে নুয়ে পড়তে গিয়ে ও আমার হাত আর কাঁধের ওপর শরীরটিকে চেপে ধরছে। এই ধরনের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘৃণায় আমার অন্তর ভরে গেল। নিজের এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর অনুভূতিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। এক অদ্ভুত ধরনের ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম। মনে হল হয় তো-বা আকস্মিক তবু

এই বিবেচনাহীন দেহ স্পর্শটাকে নিতান্তই ইচ্ছাকৃত ভেবে নেওয়া যায়।

ও সরে দাঁড়াবে ভেবে একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। কিন্তু ও নড়ল না, আর নড়ারও উপায় বোধ হয় ওর ছিল না। ঘৃণার প্রাবল্যে বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল আমার। দ্রুতবেগে আমি পিছিয়ে বসলাম আর সেই মুহূর্তেই আমার গালের ওপর এণ্টোনিওর ক্ষুরটি বসে গেল।

এণ্টোনিওর ওপর ক্রোধ আর ঘৃণার একটা প্রচণ্ড প্রবাহ নেমে এল আমার মধ্যে। ও ততক্ষণে ক্ষুর হাতে পিছিয়ে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছিল। যেখানটা কেটে রক্ত ঝরছিল সে জায়গায় হাত দিয়ে আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'কা করছ তুমি, তুমি কি পাগল?'

'কিন্তু সিনর ব্যলদেশী, আপনিই তো ভীষণ ভাবে নড়ে উঠে-ছিলেন,' উত্তর দিল এণ্টোনিও।

'না, তা সত্যি নয়,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

সামাজিক মর্যাদায় যারা ছোট তারা যখন দেখে ওপরওয়ালা তাকে ভুল বুঝছে তখন যেমন অনুনয়ের কাতর ভঙ্গিতে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গেই তারা কথা বলে, তেমনিভাবে এণ্টোনিও বলল, 'আপনি না নড়লে কা করে কেটে যাওয়া সম্ভব বলুন সিনর? বিশ্বাস করুন, আপনি নড়ে ছিলেন। তবে এমন কিছু হয় নি, আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন'। একটু তুলোয় করে টেবিল থেকে ছিপি খুলে ও খানিকটা স্পিরিট নিয়ে এল।

আমি কিন্তু ক্রোধে চেঁচিয়েই বলে উঠলাম, 'কী বলতে চাও তুমি? এমন কিছু হয় নি মানে? বিশ্রী ভাবে কেটে গেছে এ জায়গাটা'। আয়নায় গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। স্পিরিট লেগে ওটা তখন জ্বলছিল। ওই জ্বালায় আমার ক্রোধ যেন আরও বেড়ে গেল। রক্ত-লাগা তুলোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম, 'তাহলে তুমি বলতে

চাও, কিছু হয় নি? তুমি জান না, তুমি কী বলছ? যাও এক্ষুণি বেরিয়ে যাও।'

'কিন্তু সিনর ব্যলদেশী, আমার কাজ যে এখনো শেষ হয় নি?'

'দরকার নেই কাজের। তুমি বেরিয়ে যাও, এক্ষুণি যাও। আর কক্ষনো যেন তোমাকে এখানে না দেখি আমি,' ক্রোধের আতিশয্যে যেন ফেটে পড়লাম আমি। 'আর কখনো তোমার মুখ দেখতে চাইনে আমি, বুঝেছ?'

'কিন্তু সিনর—'

'যথেষ্ট হয়েছে, বেরিয়ে যাও বলছি।'

'আগামী কাল আসব তো?'

'না, কোনো দিনই না।' ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গলায় সেই তোয়ালে-বাঁধা অবস্থায় চেঁচিয়ে ওকে আমার স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম। বেশ মনে আছে ও যেন একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে বলল, 'তা আপনি যা ভাল মনে করেন।' এরপর সে বাইরে চলে গেল।

একা খানিকক্ষণ থাকার পর আমার রাগ পড়ে গেল। তখন তোয়ালেটা খুলে মুখের সাবানটুকু ধুয়ে ফেললাম। কামানোর শেষেই ক্ষতটা হয়েছিল। মসৃণ মুখের ওপর তাই ঐ লাল রঙের ক্ষতটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। তুলোয় আবার একটু স্পিরিট নিয়ে ক্ষতটাকে জীবাণুমুক্ত করে নিলাম। যে আকস্মিক আবেগে এন্টোনিওকে তাড়িয়ে দিলাম সে কথা একটু ভাবতেই বুঝলাম কেটে যাওয়ার ঘটনাটা নেহাত একটা অজুহাত মাত্র। ওকে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। আজকের প্রথম সুযোগটি পেয়ে সেটির আমি সদ্ব্যবহার করেছি মাত্র। এও বুঝলাম যে গল্পলেখার কাজ শেষ করে ফেলার পর ওকে তাড়ালে যে ক্ষতি নেই, এ অনুভূতিও অন্যতম কারণ। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে এ খবরটি আমি উপহার দিতে পারি না। স্বার্থপরের মত

এতদিন ওকে কাজে লাগিয়ে রেখেছিলাম, স্ত্রার কোন অভিযোগ কানে তুলিনি। মনে হল, স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার আমি করি নি। যাই হোক, পোশাক বদলে নীচে নেমে এলাম।

আমার স্ত্রী খাবার ঘরেই ছিল। কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকার পর জানালাম, 'আজ সত্যি সত্যি এণ্টোনিওকে তাড়িয়ে দিলাম, বুঝলে।'

খাওয়ার প্লেট থেকে চোখ না তুলেই ও প্রশ্ন করল, 'এরপর কামানোর কী করবে?'

'নিজেই কামানোর চেষ্টা করব। তাছাড়া আর কদিনেরই বা ব্যাপার। চলেই তো যেতে হবে তাড়াতাড়ি, তাইনা? আজ যে ওর কী হয়েছিল কে জানে। এই দেখ প্রায় একআঙ্গুল কেটে গেছে।'

লীডা মুখ তুলে ক্ষতটা দেখল। বেশ ভয়ের সঙ্গেই বলল, 'একটু কিছু এ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে নিয়েছ?'

'তা নিয়েছি। তবে কি জান, কেটে যাওয়ার এ ব্যাপারটা নিতান্তই একটা অজুহাত মাত্র। আসলে আমি এণ্টোনিওকে সহ্য করতে পারছিলাম না। তুমি যা বলেছিলে তা ঠিক।'

'তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?'

এঞ্জেলোর থেকে যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছিলাম সেটি এবার বলা দরকার বলেই মনে হল। কিন্তু সময়টা বদলে নেবার জন্য একটু বানিয়ে বললাম, 'আজ সকালেই এঞ্জেলোর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। শুনলাম এণ্টোনিও একটা অসংযত লম্পট। ও মেয়েদের বিরক্ত করে বেড়ায়। এ ব্যাপারটা কিন্তু সবাই জানে। তাই মনে হল ইচ্ছাকৃত ভাবে ও তোমার অসম্মান করেছে এমন প্রমাণ না থাকলেও তোমার অভিযোগ অনেকখানি সত্য। আজকে তাই কেটে যাওয়ার ঘটনাটাকে কাজে লাগিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিলাম।'

লীডা কিছুই বলল না। আমিই বলে চললাম, 'আর মেয়েরাই

বা টাকমাথা বেঁটে হলদে-মুখো মোটা মানুষটার মধ্যে কী যে পায় তা তারাই জানে। ও নিশ্চয় ভেনাসের প্রণয়পাত্র হবার মত সুন্দর যুবক নয়।'

এসব কথার উত্তরে স্ত্রীর দিক থেকে প্রশ্ন হল, 'শহরে তোমার কাগজ পেলে ?'

'না, ঠিক ঐ কাগজ পেলাম না। কিছু ফুলস্‌ক্যাপ কিনে এনেছি, ওতেই চলে যাবে।' বুঝলাম এণ্টোনিও প্রসঙ্গটা ওর মোটেই ভাল লাগছে না তাই ও অন্যকথা পাড়তে চাইছে। আমিও তাই বললাম, 'আজ থেকেই টাইপ করা শুরু করব। বিকেল আর সন্ধ্যেগুলো কাজে লাগিয়ে আমি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলব।' ও একমনে খেয়ে যেতে লাগল, আমি কিছুক্ষণ বইর কথা, আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা এসব বলে হঠাৎ ওর হাতটা টেনে নিয়ে বললাম, 'তোমার ভালোবাসা না পেলে এ বই কিছুতেই আমি লিখতে পারতাম না। তাই ঠিক করেছি এ বই আমি তোমার নামেই উৎসর্গ করব।' ও হেসে আমার দিকে চোখ তুলে চাইল। আমার মনে হল ওর মধ্যে যে মঙ্গলকামনার অকৃত্রিম দিকটি বহুবার চোখে পড়েছে আজ যেন ওর চোখে দেখলাম তারই চরম প্রকাশ। একটা অন্ধ মানুষও এটি না দেখে পারে না। ওর হাতটিকে আমার হাতের মধ্যে নিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। আমার আগ্রহ আবার ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। ছেলে এসে বিরক্ত করুক এমনটি চাইছে না মা, অথচ এমনি অবস্থায় ছেলে দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন বলে 'মাগো বড় হলে আমি একজন সেনাপতি হবো' ঠিক তখন মা যেমন করে হাসেন, লীডা যেন তেমনিভাবে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'উৎসর্গের পৃষ্ঠায় কী লিখবে ?'

মনে মনে ওর প্রশ্নের কি উত্তর দেব তা ঠিক করে নিলাম, আর একটু বিব্রত হয়েই যেন উত্তর দিলাম, 'তেমন

কিছু লিখব' না। এই ধর যেমন, আমার স্ত্রীকে, 'লীডাকে বা এমনি কিছু। বেশী লম্বা করে বলা কি ভাল লাগবে তোমার?'

'না না, তা বলছি না।'

ও যে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে আছে তা বেশ বুঝলাম। হাতটা আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে আমিও জানালার বাইরে তাকিয়ে নীরব-চিন্তায় ডুবে গেলাম। ভাবলাম আমাদের কেউ একজন আগে কথা বলবে কিন্তু উভয়েই চুপচাপ বসে রইলাম। ওর দিকে তাকিয়ে যেকেউ বলবে যে ও এক কঠিন আর চূড়ান্ত নীরবতার গভীর আবরণে নিজেকে ঢেকে নিয়েছে। এর বাইরে আসার তার একবিন্দুও ইচ্ছে নাই। আমার দিক থেকে নৈরাশ্যের কোনো কারণ ঘটেনি সেইটে প্রমাণ করার জন্যেই যেন রসিকতা করে বললাম, জান, কোনো এক লেখক স্ত্রীকে বই উৎসর্গ করতে গিয়ে কি লিখেছিলেন? 'আমার স্ত্রীকে, যাঁর অনুপস্থিতি ছাড়া এ বই কখনোই লেখা সম্ভব হত না।'

লীডা মৃদু হেসে উঠতেই আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঘটনাটা সম্পূর্ণ বিপরীত। তোমার উপস্থিতি ছাড়া এ বই লেখা কোনোরকমেই সম্ভব হত না।'

ওর মুখে কিন্তু আর হাসির রেখা দেখলাম না, তাই না বলে পারলাম না, 'তুমি যদি না চাও তবে আমি উৎসর্গ পত্রই রাখব না।'

শেষের কথাগুলোতে আমার কণ্ঠে একটু তিক্ততার আভাস ফুটে উঠেছিল হয়তো। ও যেন একটু সচেষ্ট হয়ে নিজেকে আলোচনার মধ্যে ফিরিয়ে আনল। আমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল 'না না সিলভিও তুমি এ কথা ভেব না যে আমি এরকম কিছু চাই না।' ওর কণ্ঠে আবার সেই সদিচ্ছার স্পর্শ পেলাম আমি। ছোট্ট ছেলেটি হতাশ হয়ে মাকে যখন বলে, 'তুমি যখন চাও না মা, আমি সেনাপতি হব না', তখন তাকে মা যেমন করে বলেন, 'কিন্তু আমি যে তোমাকে সেনাপতিই দেখতে চাই। কত কত যুদ্ধ তুমি জয় করে আসবে,'—

লীডার কথায় যেন অনেকটা সেই সুর শুনলাম আমি। বুঝলাম কথা বাড়িয়ে লাভ সেই। তখন এন্টোনিওর ওপর চটে ওঠার কারণ ভেবেছিলাম আমার ক্ষুধা, এখন কিন্তু আবার তেমনি মনটা বিষিয়ে উঠছিল, তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। উঠতে গিয়ে লীডাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য বললাম, 'অ্যানা বোধ হয় কফি নিয়ে বাইরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

বারো

লীডা শোবার ঘরে চলে যাবার পর আমিও চলে এলাম আমার পড়ার ঘরে। টাইপরাইটারটি খুলে ওর ঢাকনাটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে আমি কাজের জন্য প্রস্তুত হলাম। ডান দিকে পাণ্ডুলিপি, বাঁ দিকে সাদা কাগজ রেখে আমি এক সঙ্গে তিনখানা করে কাগজ কার্বন দিয়ে টাইপ করতে শুরু করলাম। বইয়ের নামটি টাইপ করতে গিয়ে দেখি কাগজ ঠিক মত লাগানো হয় নি বলে টাইপটি একদিকে হয়ে গেছে। তাছাড়া ওটা বড় অক্ষরে টাইপ করা উচিত ছিল, তাও হয়নি। আবার তিনখানা কাগজ নিয়ে কাজ আরম্ভ করা গেল। এবারটা নাম ঠিক মাঝখানে করা গেল বটে কিন্তু ওদিকে কার্বনগুলো ঠিক মত দেওয়া হয় নি বলে তলার দুখানা কাগজে টাইপই উঠল না।

মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল। মেসিন থেকে কাগজগুলো বার করে ছিঁড়ে ফেললাম। আবার তিনখানা কাগজ নিয়ে কাজ শুরু করে দেখা গেল কম করে গোটা দুই-তিন ভুল হয়ে গেছে টাইপে। সত্যি কথা বলতে কি এবার আমি ভয় পেয়ে গেলাম। টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে যে বড় বড় জার্মান ছবিগুলো ছিল তাই দেখে বেড়াতে লাগলাম। ওখানে ছিল ‘কামারসির দুর্গ’ ‘ওয়াইমার শহরের দৃশ্য,’ ‘লেক ষ্টার্নবার্গের বুকে ঝড়’ আর ‘রাইনের ঝরনা’। সারা বাড়িটা তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের মৃদু আলোকের মধ্যে নিশ্চিন্ত নিদ্রার জন্য আহ্বান ফুটে উঠছে। বুঝলাম আমি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কোনো কাজ করাই আমার পক্ষে এখন সম্ভব নয়। ঘরের এক অন্ধকার কোণে একটা শক্ত সোফার ওপর গিয়ে তাই শুয়েই পড়লাম।

শুয়ে থেকেই আমি পাশের একটা ছোট্ট টেবিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ওটার ওপর গয়নার বাক্স, নানাধরনের কৌটো ইত্যাদি ছিল। ওখান থেকে একটা চামড়ায়-বাঁধানো খাতা টেনে নিয়ে দেখলাম ওটা ১৮৬০ সালের একটা স্মৃতিচিহ্ন। একটু আগে যে ধরনের ছবি দেখছিলাম, খাতার মালিক প্রতিটি পৃষ্ঠায় তেমনি ধরনের কালি কলম দিয়ে ছবি এঁকেছেন। প্রতিটি ছবির তলায় আবার টানা হাতের লেখায় ইংরেজীতে ফরাসী দেশীয় নীতি-কথার উদ্ধৃতি। প্রতিটি ছবি ভাল করে দেখে তার তলার আবেগসিক্ত উদ্ধৃতিগুলি মন দিয়ে পড়তে পড়তে দেখি ঘুম এসে গেছে। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে কখন যেন গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম!

বড জোর ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে থাকব আমি, কিন্তু ঐটুকু সময়ের মধ্যে ঘুমের ঘোরে টেবিল চেয়ার, টাইপরাইটার সবই দেখলাম। কাজ করতে ইচ্ছে হল, কিন্তু অদ্ভুত এক অক্ষমতায় আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম। ঠিক এমনি সময় হঠাৎ কি যেন একটা সঙ্কেতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি জেগে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

ঘরের মধ্যে তখনও আবছা অন্ধকার। জানালার পাল্লাগুলো পুরো খুলে দিয়ে দেখি রোদ উঠেছে। কিছু না ভেবে আমি কাজে বসে গেলাম।

গোটা দুয়েক পৃষ্ঠা যন্ত্র-চালিতের মত টাইপ করে তৃতীয় পৃষ্ঠায় এসে হঠাৎ থেমে গেলাম। আমি তেমন কিছু ভাবছিলাম না গভীরভাবে। আমার কেবলই মনে হতে লাগল, যে শব্দগুলো কদিন আগে উৎসাহের ব্যগ্রতায় নিজেই প্রয়োগ করেছি, সেগুলোকেই এই মুহূর্তে অর্থহীন ঠেকছে। অভিধানের পাতায় যেমন করে কতকগুলো শব্দসমষ্টি জড় হয়ে থাকে, এও যেন তেমনি নিরর্থক শব্দের অপ্রয়োজনীয় সমাবেশ মাত্র। এমনি ভাবনায় যখন মগ্ন, তখন লীডা আমার চা-এর প্রয়োজন আছে কিনা জানবার জন্য দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল। পাণ্ডুলিপির সামনে বসে যে অবাস্তব চিন্তায় জর্জরিত

হয়ে উঠছিলাম তা থেকে মুক্তির আহ্বান যেন পেলাম আমি। সোজা উঠে ওর পেছনে পেছনে নীচে নেমে গেলাম। ও বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই চায়ের টেবিলে এসেছিল। আমি ততক্ষণে বেশ সামলে নিয়েছি। চা খেতে খেতে নানা কথাই ওর সঙ্গে আলোচনা করে গেলাম। ওকেও মোটে অন্যমনস্ক বা চিন্তিত মনে হল না, খুব আনন্দ পেলাম কথায় কথায়। চা খাওয়ার পর প্রাত্যহিক নিয়মমত বেড়াতে বেরুলাম আমরা।

আগেই বলেছি বেড়াবার মত খুব বেশী রাস্তাঘাট ওখানে ছিল-না। মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা ছোট রাস্তা ধরে আমি আগে, লীডা আমার পেছনে, এমনি ভাবে এগিয়ে চললাম। একটু পরেই বুঝলাম আমার মনের সেই বিষণ্ণতা জমাট বেঁধে রয়েছে। পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহ করে-আনা সেই অস্পষ্ট মানসিক দুর্বলতাটি কাটিয়ে উঠতে চাইলাম। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে মনের অস্পষ্ট অবস্থাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। রাস্তাটি এঁকে বেঁকে মাঠের মাঝখান দিয়ে এমন ভাবে চলে গেছে যাতে এক এক জায়গায় কতকগুলো খামারবাড়ি জড় হয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে, কোথাও একটা বিচ্ছিন্ন কুটিরের পাশে একটা ফসল-মাড়ানো মঞ্চের গা ঘেঁষে একটা তরকারি ক্ষেত আর খানার পাশ দিয়ে পথটি চলে গেছে একটা আঙ্গুর ক্ষেতের পাশ বরাবর। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূরের মধ্যে ক্ষেত খামার, গাছপালা সবকিছুই সূর্যালোকে ঝলমল করছিল। নীল আকাশের বুকে গাছের মাথাগুলোকে কাল ছবির মত ঠেকলেও ওদের প্রত্যেকটি পাতা যেন চকচক করে জ্বলছিল। একটা গভীর খানার ওপর বাঁকা সেতু ধরে আমার স্ত্রী যখন এগিয়ে চলছিল, একটু থেমে গেলাম আমি ওকে খুঁটিয়ে দেখবার জন্য। ও পরেছিল লাল, সবুজ, হলদে আর নীল ফুট্‌কী দেওয়া একটা ধূসর রঙের খাটো জামা আর তার ওপর কোট। সকালবেলায় পাণ্ডুলিপির শব্দগুলোকে যে ভাবে অর্থহীন মনে হয়েছিল ওকেও তেমনি আমার সামনে

সময়ের চিত্রপটে একটি অর্থহীন বিন্দুমাত্র মনে হল। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে যেন পৃথিবীর সবচেয়ে অবাস্তর কথাগুলোই বেরোতে লাগল। আমি যেন বলতে শুরু করলাম, আমার নাম সিলভিও ব্যলদেশী। আমি বিয়ে করেছি একটি মেয়েকে তার নাম লীডা।

আসলে কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কথাই বেরুচ্ছিল না। বেশ বুঝলাম হঠাৎ একটা যন্ত্রণা না পেলে মনের এই অবাস্তব বন্ধন থেকে মুক্তি পাব না। যদি এমনি সময় হঠাৎ আমার স্ত্রীর চুলের গোছাটি ধরে ওকে ফেলে দিই তলার পাথরগুলোর ওপর আর পরিবর্তে ওর দিক থেকে পাই একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত তাহলে মন্দ হয় না। এমনও হতে পারে যে আমার পাণ্ডুলিপির সঠিক মূল্যবোধের জন্য ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আগুনে ছুঁড়ে ফেলাই আমার প্রয়োজন।

বেশ বুঝলাম আমি পাগল হয়ে গেছি। নিদারুণ যন্ত্রণা না পেলে নিজের ওপর আস্থা বা অপরের উপস্থিতি সম্বন্ধে ধারণা আমার কিছুতেই ফিরে আসবে না। এরই মাঝখানে নিজেকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম এই বলে যে আমার স্ত্রী বা আমার রচনার পাণ্ডুলিপি যদি দুর্বোধ্যও হয়ে থাকে তবে তা আর কারো দোষ নয়, নিতান্তই আমার মানসিক অক্ষমতা।

আমার স্ত্রী ততক্ষণে বসে পড়বার একটা জায়গা খুঁজছিল। ওসব জায়গায় বসবার মত ঠাঁইটুকু পাওয়াও শক্ত। ওখানকার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় চাষ করা হয়ে থাকে, প্রতিটি গাছই মূল্যবান, এমন কি প্রতিটি মাটির ঢেলার মধ্যে ফসলের বীজ থাকে লুকিয়ে। আমরা একটু দূরে একটা ছোট্ট নদীর পাড়ে গিয়ে বসলাম। নদীটার নাম 'এস্' হয়তো-বা এ নাম তার বাঁকাচোরা গতিপথের জন্যই। যেখানে আমরা বসবার জায়গা করে নিলাম ওখানেই নদীটা বাঁক নিয়ে একটা হ্রদের মত তৈরি করেছিল। সবুজ জলের সেই দর্পণ

ঘিরে ঝুঁকেছিল কয়েকটা পপ্‌লার গাছ। মেয়েরা যে ধরনের সিমেণ্টের জমানো টুক্‌রোর ওপর কাপড় ধোয়, তেমনি একটা সিমেণ্টের টুক্‌রো জলে আধডোবা অবস্থায় পড়েছিল। সবুজ ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে লীডা মন্তব্য করল যে গাঁয়ের এসব জায়গার সবটুকুই কাজে লাগে।

সায়াহ্নের সেই নিস্তব্ধ কোমল পরিবেশে আমরা মৃদুকণ্ঠে আলাপ করছিলাম। লীডা একটা ঘাস মুখে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে চিবিয়ে চলেছিল আর আমিও তাকিয়ে বসেছিলাম জলের ওপরকার পপ্‌লারের ভাঙা ভাঙা প্রতিবিম্বের দিকে। এ-কথা ও-কথার মাঝখানে কী একটা কথায় (আমি অবশ্য শীতের সময় ও পাহাড়ে যেতে চায় কি না জিজ্ঞেস করেছিলাম) ও তার অতীত জীবনের এক কাহিনীর উল্লেখ করে বসল। ওটা ঘটেছিল প্রায় দু বছর আগে এক পার্বত্য আবাসে। আগেই বলেছি লীডার প্রথম বিয়ে টিকে ছিল বড্ড কম সময়। সে-বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর লীডা যে দশটি বছর একক কাটিয়েছে, ওর মধ্যে প্রেমিকের অভাব ওর ছিল না। আমার সেই পূর্ববর্তী ভদ্রলোকদের প্রতি আমার কোনো রকমের ঈর্ষা বোধ ছিল না। তাই প্রথম প্রথম লীডা ওদের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেও এখন কিন্তু একেবারে খোলাখুলিই বলে যায়। সে যে কেন এরকম করত তা অবশ্য আমি বলতে পারব না, হয় তো কিছুটা অহঙ্কার প্রকাশের জন্য, হয় তো বা তার সেই বল্গাহীন স্বাধীন জীবনের অনুশোচনায়। গল্পগুলো শুনতে যে আমার আনন্দ হত তা বলতে পারি না। আমার মধ্যে যে অনুভূতির তীক্ষ্ণতা রয়েছে তারই জন্য হয়তো বা দেখতাম মাঝে মাঝে কাহিনীর বৈশিষ্ট্যে চমকে উঠছি আমি। তবে এ বিস্ময় প্রকাশ কোনো সময়ই স্বেচ্ছাকৃত ছিল না। ঈর্ষা একে বলা চলে না বা গর্ববোধ করাও চলে না আমার বুদ্ধিনিষ্ঠ বিষয়মুখী মনোভাবের প্রকাশ বলে। কিন্তু আজকে লম্বা-ঘাসের ডগাটি চিবুতে চিবুতে ও যখন তার কল্পলোকে অন্যমনস্ক দৃষ্টি

নিবদ্ধ করে একটি অন্যতম. প্রেম কাহিনী বর্ণনা করে গেল তখন বেশ বুঝলাম যে ওর অতীত কাহিনী আমার মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক অনুভূতি সৃষ্টি করছে। মূর্চ্ছা ভাঙিয়ে একটি মানুষকে খাড়া রাখবার দিক থেকে টনিক হিসেবে এ ধরনের কাহিনী অবশ্য অনবদ্য সন্দেহ নেই। গল্প শুনতে বসে মনে হয়েছিল একটা অবাস্তব ঘটনা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনতে হবে আমাকে। এখন বুঝলাম ও নিতান্ত বাস্তব ঘটনাটি আবেগতপ্ত কণ্ঠে বর্ণনা করে যাচ্ছে। এতে ও বেশ মজা পেয়েছিল বটে, কিন্তু আমার পক্ষে এ কাহিনী শোনার চেয়ে আর যন্ত্রণাদায়ক কী-ই বা হতে পারে। যাদের ধমনীতে তপ্ততর রক্ত-স্রোত প্রবাহিত তারা এ ধরনের কাহিনী শুনতে শুনতে হয়তো উত্তেজিত হত, লীডাকে ঘৃণা করতে শুরু করত; কিন্তু আমার মধ্যে রক্তের তাপের অভাব ছিল, হয়তো বা তাই ঘটনাটি শুনতে শুনতে আমি আমাদের উভয়ের সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়নটুকু করে নিলাম। যাকে তার পছন্দ হয়েছিল তাকে কীভাবে ও ডেকে এনেছে, চুম্বন করে একত্রে রাত কাটানোর সম্মতি দিয়েছে, এসব কাহিনী ও যখন অবলীলাক্রমে বলে গেল তখন আমি যে একটু কষ্ট পেলাম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কষ্টটুকু আমার স্তিমিতপ্রায় জীবনীশক্তিকে ফিরিয়ে দিল আমার মধ্যে, তাই কাহিনীর তিক্ততাগুলো আমার মনে মধুরতারই সৃষ্টি করল মাত্র। একে সেই বিষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে যার স্বল্প পরিমাণ গ্রহণে রোগীকে পুনর্জন্ম দান করে।

অ্যালাপিনিতে একবার এক লালচুলওয়ালা সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে কীভাবে ওর এক ঘটনা ঘটে তাই বলল লীডা। ও বলল, 'আমি তখন অ্যালপিনি পাহাড়ে। মার্চ মাস। বরফ গলে গেছে। তাই প্রায় পাঁচ হাজার ফুট ওপরে পর্বতারোহীদের হোটেলে গিয়ে থাকলাম আমি। ওখানে প্রায়ই কেউ আসতনা। লম্বা ছাদের ওপর চেয়ারে বসে রোদ পোয়ানো আর বই পড়াতেই দিনগুলো কাটছিল। হঠাৎ একদিন একদল অ্যালপিনি নীচ থেকে ওপরে

উঠে এল। ওরা ওদের স্কীগুলো খুলে রেখে হোটেলের মধ্যে গেল বোধহয় একটু মদ খেয়ে নিতে। ওদের মধ্যে লালচুল আর রোদে-ঝলসানো-মুখওয়ালা একজন যুবক লেপ্টেন্যান্ট ছিল। ওর মাথায় টুপি বা গায়ে জ্যাকেট ছিল না। ঢিলে ছাইরঙের সার্ট পরেছিল ও। নিজের স্কী খুলতে ও যখন নুয়েছে তখন সবল পিঠের দিকটা থেকে কোমর পর্যন্ত আমার নজরে পড়ল। সোজা দাঁড়াতেই দুজন দুজনকে দেখলাম। কিন্তু আমার মনে হল হয়তো ও আমার মনের কথা বুঝতে পারেনি, সত্যি তুমি গল্পটা শুনলেই বুঝবে যে তখনো সে আমাকে বুঝতে পারেনি। যাই হোক আমি হোটেলের প্রধান ঘরটায় চলে এলাম। সেও বরফের মধ্যে স্কীটাকে পুঁতে রেখে আমার পেছনে পেছনে এল। ওর সঙ্গীরা ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে বসেছিল। ও এসে ওদের সঙ্গে বসে গেল। আমি এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে ওদের বিপরীত দিকের একটা টেবিলে গিয়ে বসলাম। ওরা হাস্যপরিহাসে মশগুল হয়ে গেল আর আমি বোকার মত কেবলই তার দৃষ্টি আর্কষণ করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম ; ও পরে অবশ্য বলেছিল যে আমার হাবভাব ও তখন লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু ও এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ করছে না দেখে ভয় করলাম যে ও বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারছে না। হঠাৎ যেই সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছে অমনি. আর যাতে ও ভুল না করে বসে, মুখে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে ওর দিকে চুমু ছুড়ে দিলাম। ও সবটুকু দেখল তবু আমার মনোভাব বুঝতে পেরেছে, হাবেভাবে এমন কিছুই দেখাল না। এবার আমার ভয় হল ওর বোধহয় আমাকে পছন্দ হয়নি। খুব গরম পড়েছে এমনি ভাব করে আমি জ্যাকেটটা খুলে ব্লাউজের কাঁধের উপর ফিতেগুলো একটু ঢিলে করে দিলাম। এর পরই কেন জানিনা আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল, আমি আমার ছাদের চেয়ারে ফিরে চলে গেলাম। একটা নিস্তব্ধ অনিশ্চয়তার ভেতর চেয়ারে বসে

রইলাম সেখানে। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। গভীর হতাশায় আমার মন ভেঙে পড়ল। ঠিক এমনি সময় দেখি ও স্কী করে নেমে আসছে ঢালু বেয়ে। আনন্দের আতিশয্যে ওকে অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে গেলাম। ও বলল, 'নতুন করে একটা কাহিনীই ফেঁদে বসতে হল আমাকে। বন্ধুরাতো কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইছিল না। যাক গে, ওতে কিছু যায় আসে না।' আমি চুপ করে রইলাম। স্বীকার করা ভাল যে উত্তেজনার ফলে কথা হারিয়ে গিয়েছিল আমার। ও তার স্কী খুলে রাখলে ধীরে ধীরে। ওর হাত ধরে তারপর ওকে দোতলায় আমার শোবার ঘরে সোজা নিয়ে চলে এলাম আমি। কল্পনা করতে পার, ওর নামই জানি নে আমি ?'

তারই সংক্ষিপ্ত ভাষায় কাহিনাটি তুলে ধরলাম আমি। কাহিনীর মধ্যে সম্ভোগ-সংক্রান্ত অংশের বর্ণনা ও মুখের ভাষায় ঠিক ঠিক দিল না বটে, কিন্তু কণ্ঠস্বরের আবেগগভীরতায় আর দেহ সঞ্চালনের বৈশিষ্ট্যে তা আমি বেশ বুঝতে পারলাম। কাহিনীর শেষে ও যেন অনেক বেশী রূপবতী আর প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। মনে হল আমি যে ভাবে মাঝে মাঝে নিষ্প্রাণ আর অবসন্ন হয়ে পড়ি তা থেকে মুক্তি পেতে হলে এই উচ্ছল প্রাণময়তার কিছু অংশ আমায় নিতেই হবে। স্ত্রীর অতীত জীবনের প্রেম-কাহিনী শ্রবণরত একজন স্বামী যেন নই আমি, বিশেষ মুহূর্তে ধারাবর্ষণের স্নেহস্পর্শে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত আমি একটি মৃত্তিকা খণ্ড মাত্র। লীডা ঘাসের ডগা মুখে দিয়ে বসেই রইল নীরবে। আমি কিন্তু বেশ অনুভব করলাম আমার কয়েক মুহূর্ত আগের সেই যন্ত্রণাদায়ক মানসিক দুর্বোধ্যতা আর আচ্ছন্নতা সম্পূর্ণভাবে কেটে গেছে।

তেরো

আমরা বেশ ধীরে সুস্থে ঘরে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আমিও শান্ত আর স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলাম। নানা হাসি তামাসার কথায় সারা পথটুকু পেরিয়ে এলাম আমরা। বাড়ি ফিরতে আমাদের একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। ও এসেই ওপরের ঘরে কাপড় বদলাতে চলে গেল, আর আমি রেডিও-গ্রামোফনে একটি রেকর্ড চাপিয়ে বসে পড়লাম। ওটা ছিল মোজার্টের একটা কোয়ার্টেট্। গানের সুরে মন আনন্দে ভরে গেল। একটু পরে কোয়ার্টেটটি যখন মিনুয়েট হয়ে দাঁড়াল ওদের সশব্দ কথাবার্তার মধ্যে একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠ আমাকে অন্য এক চিন্তার ক্ষেত্রে নিয়ে গেল। ওদের আনন্দময় প্রশ্ন আর ঈষৎ ব্যথাতুর উত্তরের মধ্যে আমি সন্ধান পেলাম দুটি বিশ্লিষ্ট মনোভাবের, একটি সক্রিয় অন্যটি নিষ্ক্রিয়; একটি অগ্রণী আর অন্যটি একটু সঙ্কুচিত হয়তো বা লজ্জিতও। এ দুটি মন যে মানুষ দুটির, যারা আজকের এই নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করেছে, তারা আজকের কি দু' শতাব্দী পূর্বের তাতে কিছুই আসে যায় না, তাদের এ মনোভাবের পরিবর্তন সময়ের প্রভাবে কোনোদিনই হয় না। অসম্ভব কি যে আমরাই ঐ নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করেছি—আমি আর আমার স্ত্রী, যেমন করে যুগযুগ ধরে অগণিত নরনারী নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করেছে আমাদের পূর্বে। চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলাম। সময়ের গতি একেবারেই লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ যখন লীডা গত সন্ধ্যার সাদা পোশাকটি পরে সামনে এসে দাঁড়াল, চমক ভাঙল আমার। একটু যেন অধৈর্যের সুরে গানটিকে অর্ধপথে বন্ধ করে দিয়ে ও বলে উঠল, 'আজ সন্ধ্যায় গান আমার একটুও ভাল লাগছে না সিলভিও। জানি না কেন।'

এরপর আমার পাশে এসে বসল লীডা। সাধারণভাবেই প্রশ্ন করল, 'তাহলে আজ সন্ধ্যা থেকে টাইপ করার কাজ শুরু করছ তো ?'

কথা বলতে বলতে ও তার ছোট্ট ব্যাগ থেকে আয়নাটি বার করে চুলে-গুঁজে রাখা টাটকা ফুলগুলো ঠিক করে নিল। পরম সন্তোষের সঙ্গেই বললাম, 'নিশ্চয় আজ সন্ধ্যা থেকে দুপুর রাত পর্যন্ত কাজ করব। দু-চার দিনের মধ্যেই কাজটি আমি শেষ করে ফেলব, আশা করি।' ও প্রশ্ন করল, নিজের মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে, 'কী বললে রাত দুপুর পর্যন্ত ? ঘুম পাবে না ?'

'তা কেন ? রাতে কাজ করা আমার অভ্যেস আছে' উত্তর দিলাম, উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ওর কোমরটি জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে বলে উঠলাম, 'তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যই কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।'

আয়নাটা ব্যাগে পুরে লীডা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেন আমরা কি একত্রে নেই ?'

'না, ঠিক যে ভাবে আমি চাই সেভাবে নেই আমরা।'

'বুঝেছি,' বলে ও হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর অধৈর্য হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করল। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'হল কী তোমার ?'

একটু যেন রূঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল লীডা, 'কিছু না, ক্ষিদে পেয়েছে। তোমার ক্ষিদে পায়নি ?'

'তাই বল ! আমি কিন্তু বেশী কিছু খাব না, ঘুম পেয়ে যাবে।'

'তুমি নিজের শরীরের দিকে খুব লক্ষ্য রাখ নিশ্চয়,' উত্তরটা শুনে একটু চমকে উঠলাম। কথাটা নিঃসন্দেহে অপ্রীতিকর। এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম।

শান্তভাবেই জানতে চাইলাম, 'কী বলতে চাও তুমি ?'

লীডা বুঝল, ও আমাকে তার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ করেছে। এগিয়ে এসে আদরের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আমি সত্যিই লজ্জিত। ক্ষিদে

পেলে মানুষ'বোধ হয় একটু রূঢ় হয়ে ওঠে, আমার কথায় কান দিও না।'

এণ্টোনিওর কাহিনী মনে পড়ল। বললাম 'কথাটা ঠিক। ক্ষিদে পেলে মানুষ বেশ রুক্ষ হয়ে ওঠে।'

এড়িয়ে যাবার জন্যই বোধহয় ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আচ্ছা আমার এ জামাটা তোমার কেমন লাগে বলত ?'

বেশ বুঝলাম, প্রসঙ্গান্তরে ও চলে যেতে চাইছে। বলেছি গত সন্ধ্যায় ও এই পোশাকটি পরেছিল। বহুবার আমি ওকে এ পোশাক পরতে দেখেছি। তবু একটু প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতেই বললাম, 'খুব সুন্দর, তোমাকে এটাতে বেশ মানায়ও। ঘুরে দাঁড়াও তো, একটু ভাল করে দেখি।'

অত্যন্ত বাধ্য মেয়ের মত ও ঘুরে দাঁড়াল। একটা পরিবর্তন চোখে পড়ল। আগের সন্ধ্যায় ও সিল্ক আর রবারে তৈরি একটা আমেরিকান কটিবন্ধ ওর প্রায় স্বচ্ছ পোশাকের ওপর ব্যবহার করেছিল। দেহের ঐ বিশেষ অংশটির গঠন ঠিক রাখার জন্যই নাকি ওটি ও ব্যবহার করে। ওটা আমার দিক থেকে খুব রুচিকর ছিল না। ওর ঢিলে পোশাকের ওপর সেই শক্ত কটিবন্ধটা বিকৃতাঙ্গ ব্যক্তিদের ব্যবহার করা জিনিসগুলোর কথাই মনে করিয়ে দিত। আজকে দেখলাম সেটি নেই। ওকে একটু নমনীয় আর স্বাস্থ্যবতী মনে হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ সন্ধ্যায় তোমার সেই আমেরিকান বর্মটি পরনি ?'

এক নজরে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ও বলল, 'না, বিরক্তি ধরে গেছে ওটার ওপর। কিন্তু তুমি জানলে কী করে ?'

'কাল সন্ধ্যায়ও তুমি ওটা পরেছিলে।'

আমাদের এই কথাবার্তার মাঝখানে পরিচারিকা এসে জানিয়ে গেল যে খাবার তৈরি। আমরা খাবার ঘরে গিয়ে বসলাম আর আমার স্ত্রী পরিবেশন শুরু করল। দেখলাম ও যা বলেছিল তার

বিপরীত করছে। বলেছিল ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু কোনো ডিস থেকে আধ চামচের বেশী কোনো খাবারই সে নিল না। না বলে পারলাম না, 'এ কি কথা? ক্ষিদে পেয়েছিল, কিন্তু কিছুই তো নিলেনা দেখছি?'

ও যেন একটু বিরক্ত হল, হয়তো ওর উলটো ধরনের কথার ফাঁদে ধরা পড়ার জন্যই। উত্তর দিল, 'না, আমি ভুল বলেছিলাম। আমার একটুও ক্ষিদে পায় নি। খাবার দেখলেই খারাপ লাগছে।'

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'শরীর ভাল নেই তোমার?'

একটু ইতস্তত করে এক নিশ্বাসে উত্তর দিল লীডা, 'মনে হয় ভালই আছে। ক্ষিদে নেই আমার।' কথার ফাঁকে ফাঁকে যেন ক্লান্তির সুর ঝরে পড়ল ওর স্বরে। কিছুক্ষণ নীরবে কাঁটাটা দিয়ে প্লেটে ঠোকাঠুকি করে সব সরিয়ে দিয়ে বুকের ওপর হাত রেখে ও বসে রইল। আমি বেশ একটু ভয় পেয়েই বললাম, 'তোমার শরীর নিশ্চয় ভাল নেই।'

এবার কিন্তু সে স্বীকার করল কথাটা। যেন এখুনি মূর্চ্ছা যাবে এমনি অবসন্নভাবে বলে উঠল, 'সত্যিই আমার শরীর ভাল নেই। খুব দুর্বল লাগছে।'

'বিছানায় শুয়ে পড়বে একটু?'

'না'।

'পরিচারিকাকে ডেকে দিই একবার, কী বল?'

'কিছু দরকার নেই, তুমি আমাকে একপাত্র মদ ঢেলে দিতে পার?'

ওর কথা মত কাজ করলাম। খানিকটা খাওয়ার পর ওকে একটু সুস্থ মনে হল। পরিচারিকা ফল দিয়ে গেল। ও একটুও কিছু ছুঁল না। আমি এক থোলো আঙ্গুর নিয়ে একটা একটা করে খেতে লাগলাম। ও এমন ভাবে চেয়ে রইল, যেন আঙ্গুরগুলো কেমন করে মুখে ফেলছি তাই দেখছে আর এক একটি করে সব গুনছে। খাওয়া

শেষ হলে •বোঁটাটি ফেলে দেওয়া মাত্রই ও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার শুতে যাচ্ছি কিন্তু।'

ওর গলার স্বরে একটু চমকে উঠলাম আমি, প্রশ্ন করলাম, 'কফি খাবে না?'

দরজার হাতলে আঙ্গুলগুলো রেখে সোজা দাঁড়িয়ে কিছুটা অস্থির-ভাবেই ও উত্তর দিল, 'না কফি খাবো না। আমি ঘুমোতে চাই এখন।'

পরিচারিকাকে বলে দিলাম ওপরে আমার কফি পৌঁছে দিতে। এরপর ওর পেছন পেছন যেতে যেতে বললাম, 'আমার কাজ এবার শুরু করব।'

ও আমার দিকে না ফিরেই কথার জবাব দিল, 'আমি ঘুমুব।' ওর কপালের ওপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'জ্বর হয়নি তো?' ও হঠাৎ সরে গিয়ে বলে উঠল, 'তুমি তো আচ্ছা মানুষ সিলভিও। সব জিনিসের খুঁটিনাটিটুকু তোমার করা চাই। আমি বেশ ভাল আছি, কিচ্ছু ভেবোনা।'

একটু বিব্রত বোধ করলাম আমি। দরজার মুখে এসে ওর হাতটি তুলে নিলাম চুমু খাওয়ার জন্য। কিন্তু একটু সঙ্কোচ প্রকাশ করে বললাম, 'তোমার কাছ থেকে একটি বিশেষ কাজ আশা করি, লীডা।'

'কী কাজ?'

'ঘরের ভেতর এসে আমার পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় একটা চুম্বন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে যাও, ওটা আমার সৌভাগ্য সূচনা করবে।'

কিছুটা চেষ্টা আর কিছুটা প্রীতি মিশিয়ে ও এমন একটা হাসি হেসে উঠল যার মধ্যে অবশ্য তার আন্তরিকতাটিও ফুটে উঠল। যাই হোক তাড়াতাড়ি আমার পড়ার ঘরে যেতে যেতে ও বলল, 'কী উৎকট শখ তোমার! সংস্কারও তো কম নয় দেখি! কিন্তু যা চাও...'

আলো জ্বেলে দিলাম। কিন্তু অন্ধকারের ভেতরই ও পথ করে আমার লেখার টেবিলে ইতিমধ্যে গিয়ে পড়েছিল। উৎসাহের প্রবলতায় ও কয়েকবার একই কথা উচ্চারণ করল, 'কোথায় সে পৃষ্ঠাটি, কোথায় চুম্বন করতে হবে আমাকে ?'

ওর কাছে পাতাটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম আমি। 'দাম্পত্য প্রেম' এই কটি কথা টাইপ-করা কাগজখানা ওর সামনে তুলে ধরলাম। কাগজটি হাতে নিয়ে ও বেশ চেঁচিয়ে পড়ল কথা কটি। কী যেন মন্তব্য ও একটা করল, একটু মুখভঙ্গি করে। আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। তারপর ঐ কাগজখানাকে মুখের কাছে তুলে ঠোঁট দুটোকে ওর ওপর চেপে ধরল। কাগজখানা তারপর নামিয়ে রেখে বলল, 'কেমন, এবার খুশি তো ?'

নাম-পৃষ্ঠাটির একটু নাচেই ফুলের দুটো পাঁপড়ির মত লাল অর্ধবৃত্ত অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। আমি সত্যিই পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম। হেসে বললাম, 'অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে।'

দ্রুত বেগে হাত তুলে আমার গালের ওপর একটা টোকা দিয়েই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমার কাজের সাফল্য কামনা করছি সিলভিও। আমি খুব ক্লান্ত—ঘুমুতে চললাম। আমি ঘুমুব কাল সকাল পর্যন্ত, মাঝখানে কোন কারণে দরজায় ধাক্কা দিও না যেন।'

'ঠিক আছে, কাল সকাল পর্যন্তই।'

পরিচারিকা কফি আনছিল। লীডা দ্রুত ওর পাশ দিয়ে নেবে গেল। আমি পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে ফেললাম। পরিচারিকাটি যখন চলে গেল তখন টাইপরাইটার খুলে নিয়ে কাজে লেগে গেলাম আমি। আমার সেই পূর্বেকার জট-পাকানো অসংযত আর পরস্পর বিরোধী চিন্তাগুলো মোটেই ছিল না। তার বদলে মনে এমন এক স্বাভাবিক স্বচ্ছতা এসেছিল যাতে এই ধারণা হল, আমার মাথা ঘড়ি বা ওজনের যন্ত্রের মত নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই নির্ভুল যান্ত্রিক মস্তিষ্কে অহঙ্কার, ভয়, আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুই ছিল না।

মনে হল আমার মাথা নিখুঁত যন্ত্রের মত নির্ভুল ভাবে কাজ করতে পারে আর এর সাহায্যে আমি এখন আমার লেখার সঠিক মূল্যায়নও করতে পারি। মুখে সিগারেট রেখেই আধখানা টাইপ-করা কাগজ থেকে আবার পুরোদমে টাইপ করতে শুরু করলাম।

কিছুক্ষণ টাইপ করার পর আমি ছাইদানে সিগারেটটি ফেলে দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি পড়তে শুরু করলাম। আমার ধারণা হল, যে কথাগুলো টাইপ করছি তা সম্পূর্ণ অর্থহীন, ভাঙা কাচের শব্দের মত ওদের অর্থ বেসুরো। আমার সুস্থ স্বচ্ছ মস্তিষ্কে মনে হল এই রচনাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনার মর্যাদা পাওয়া তো দূরের কথা, আসলে ওটা একটা নিকৃষ্ট শ্রেণীর সৃষ্টি। আমার যে সাহিত্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে আর সমালোচক হিসেবে আমি খুব খারাপ নই এ কথা আগেই বলেছি। লেখার কাগজগুলো হাতে নিয়ে আমার মনে হল যে আমার বর্তমান মানসিকতায় সমালোচনা করবার শক্তি সুন্দর ভাবেই কাজ করছে। বুঝলাম যে রচনার শব্দগুলোকে এক একটি ধাতব খণ্ডের মত আমি আমার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখছি। সমস্ত লেখাটা পড়তে গেলে পাছে কাহিনীর চলমান ছন্দে আকৃষ্ট হই সেই আশঙ্কায় একটু একটু করে এখানে ওখানে পড়ে দেখলাম। এবার যে আমার ভুল হচ্ছে না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। বুঝলাম, কাহিনীটি একেবারে অচল, আর তার চেয়েও বড় কথা এই যে এর কোনো প্রতিকার নেই এখন। আগে যখন বইএর সমালোচনা করতাম তখন যা করতাম এখনও তাই করতে শুরু করলাম। একখানা সাদা কাগজ আর কলম নিয়ে আমার মনে লেখাটির সম্পর্কে যা যা ধারণা সৃষ্টি হল তা লিখে ফেললাম। আসলে আমাকে তখন একটা বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার নেশা পেয়ে বসেছিল।

কাগজের ওপরে লিখলাম 'সিলভিও ব্যলদেশী রচিত দাম্পত্য-প্রেম শীর্ষক কাহিনী সম্বন্ধে বক্তব্য।' ওর নীচে লাইন টেনে আগে ঠিক যেমন করে বিচ্ছিন্ন ভাবে দফাওয়ারী মন্তব্যগুলো লিখে, শেষে সব

কিছু মিলিয়ে একটা রায় দিতাম, এখন তাই করতে শুরু করলাম। নিজের সম্বন্ধেই যে আমি একটা প্রবন্ধ রচনা করতে চাইছিলাম তা নয়, আসলে কাহিনীটা আমার কাছে কেন খারাপ লাগছে তারই কারণগুলো সংগ্রহ করে আমার অনুভূতির সত্যতা প্রমাণ করতে চাইছিলাম আমি। আমি যে এই লেখাটাকে একটা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ম ভেবে নিয়েছিলাম তার জন্য নিজেকে কিছু শাস্তি দেওয়াও বোধহয় এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সবকিছুর ওপর যে মনোভাব কাজ করছিল তা হল আমার সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কিত আকাঙ্ক্ষার যৌক্তিকতাটিকে চূড়ান্ত আর পরিচ্ছন্ন ভাবে বিচার করে দেখা।

চৌদ্দ

কাগজের ওপর আমি যা লিখেছিলাম তা হল এই : 'প্রথম—রচনা-রীতি :' এরপরই তাড়াতাড়ি এই কথা কটি লিখেছি, 'ঝরঝরে, নির্ভুল, আড়ম্বরপূর্ণ, মৌলিকতাহীন, ব্যক্তিত্বস্পর্শবিহীন সরসতা বর্জিত। সংক্ষিপ্ততার ক্ষেত্রে বাগ্‌বিস্তৃতি, প্রয়োজনীয় বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অযথা বাগ্‌সংযম, ব্যবহারগত ত্রুটির জন্য অকারণ প্রাচুর্যমণ্ডিত, বৈশিষ্ট্য-বর্জিত রচনারীতি, পরিশীলিত, এবং সে কারণে কাব্যধর্মীগুণাবলীর বিন্দুমাত্রও চিহ্ন নাই। দ্বিতীয়—নমনীয়তা নাই। উপস্থাপনরীতির পরিবর্তে কথনরীতির প্রযুক্তি, রচনা চিত্রধর্মী নয়, সত্যের স্বাভাবিক গভীরতা বা বিস্তৃতি নাই। তৃতীয়—চরিত্র : অনুপস্থিত। সহানুভূতি-পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কোনো চরিত্র চিত্রিত হয় নাই, ত্রুটিপূর্ণ অনুকরণ-বৃত্তির সহায়তায় উপস্থাপিত চরিত্র অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়েব ও অস্পষ্ট। রসদৃষ্টি প্রাণহীন, তুচ্ছ বস্তুর বর্ণনায় অকারণ মুখরতা। সংহতিহীন আপাতবিরোধী চরিত্রগুলি একান্তই অস্থায়ী। 'পাওলো' বা 'লরেন্সো', 'এলাইসা' বা 'মারিয়া' নামকরণে বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক তাহাদের স্থান পরিবর্তনে রচনার কোনো অঙ্গহানি ঘটে না। বস্তুত এগুলি চরিত্র নয় অস্পষ্ট চিত্র মাত্র। চতুর্থ—মনস্তাত্ত্বিক সত্য : অকিঞ্চিৎ-কর। বিবেকঘটিত প্রশ্নবাহুল্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত সূক্ষ্ম বহু প্রশ্নের অবতারণা, সামঞ্জস্যহীন মন্তব্যের অকারণ সমাবেশ ও সাধারণ বুদ্ধির অভাব। লেখক যে সত্য কথা বর্ণনা করিয়া কূটতর্কের সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বনে ঘন ঘন বহির্লোক হইতে অন্তর্লোকে প্রস্থান করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পঞ্চম—অনুভূতি : শীতল ও নির্জীব। আপাতদৃষ্ট আবেগোচ্ছ্বাস ও স্ফীতির অন্তরালে অক্ষমতা ও শূন্যতা

নিহিত। অনুভূতিবিহীন ভাবপ্রবণতার আধিক্য। ষষ্ঠ—কাহিনী-বিন্যাস ঃ আপাতদৃষ্ট মসৃণ কুশল কাহিনী-সংস্থানের অন্তরালে ভ্রান্ত গঠন-কুশলতা, ভারসাম্য হীনতা, বর্জনশীল মনোভাব, অনাবশ্যক শব্দে রচনা ভারাক্রান্ত করণের মনোভাব প্রভৃতি লক্ষণীয়। লেখক কর্তৃক সমস্যা সমাধানে দৈব সাহায্য প্রাপ্তির ঘটনাপ্রাচুর্য উপস্থিত। রচনার কেন্দ্রে কোনো বিষয় বৈশিষ্ট্য না থাকায় পরিধিপ্রান্তেই লেখকের অনুবর্তন। সপ্তম ও শেষ—সামগ্রিক উপলব্ধিমূলক মন্তব্য ঃ এই পল্লবগ্রাহী শিল্পরসিকের বুদ্ধি, সংস্কৃতিবোধ ও রুচিশীলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সৃজনীপ্রতিভা নাই। পুস্তকটির নিজস্ব কোন বক্তব্য নাই। অন্যান্য বহু পুস্তকনির্ভরতায় রচিত ইহা একটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা। ইহাকে উষ্ণ আরামপ্রদ আশ্রয়ে রচিত একটি অর্থহীন রচনা বলা যায়। প্রয়োগবাদী উপসংহার ঃ পুস্তকটি অবশ্যই মুদ্রণযোগ্য। প্রখ্যাত শিল্পীচিত্রিত কয়েকটি চিত্রসমন্বিত একটি শোভন সংস্করণও প্রকাশ করা যায়। সাহিত্যরসিকগণের মধ্যে যথাযোগ্য প্রচার কার্যের পর কিছু সাফল্য অবশ্যই আশা করা যায়। সমালোচকগণের সহিত হৃদ্যতার পরিমাণ যথেষ্ট থাকিলে প্রশংসাসূচক আলোচনা প্রকাশও সম্ভব। তবে পুস্তকটির নিজস্ব কোন মূল্য নাই।' আমার রচনা সম্বন্ধে আমার এই সুচিন্তিত শেষ মন্তব্যটি রেখাঙ্কিত করার পর আবার একটু যোগ করে দিলাম ঃ 'একটি শান্ত ও সুখসিক্ত মনের যে পরিচয় লেখক এই গ্রন্থে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে মূল্যবান। রচনাকালে লেখক যে একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি সৃষ্টি করিতেছেন এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ নিজের চরিত্রচিত্রণে তিনি সার্থকতা অর্জন করিয়াছেন। সেই দিক হইতে পুস্তকটি সৃজনীশক্তি বর্জিত, কামনানিষ্ঠ একজন অক্ষম দিবা-স্বপ্ন দর্শকের দর্পণ স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে।'

কাজ শেষ হয়ে গেল আমার। টাইপরাইটার থেকে কাগজগুলি বার করে আর পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে গুছিয়ে তুলে রাখলাম। এরপর একটা

সিগারেট ধরিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু হল আমার। নিজের রচনার ওপর নির্দয় সমালোচনাটি লেখার পর বেশ বুঝলাম যে আগে মনের যে অবস্থাকে আমি পরিচ্ছন্ন রসদৃষ্টি ভ্রমে আনন্দিত হয়েছিলাম সেটি আসলে বিভ্রান্ত চঞ্চল মনের বাতুলতা মাত্র। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে বিচূর্ণ জাহাজের ছোটবড় অংশগুলোর ওপর যেমন শান্ত চন্দ্রালোক ছড়িয়ে পড়ে আমার আকাঙ্ক্ষার ভগ্ন অংশগুলোর ওপর ঠিক তেমনি করে আমার শান্ত মনের স্পর্শ তার সমস্ত রিক্ততাকে সম্পূর্ণ করে তুলল। সমস্ত কাজ আর চিন্তার জগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে বিশটি দিন আমি লেখার ভেতর কাটিয়েছি, তখন যে আমার চেতন মনের গভীরতায় বিরাট এক হতাশা বাসা বেঁধেছিল, এ কথা বুঝতে আজ আর অসুবিধে হল না। মনের স্বাভাবিকতা আমার বজায় ছিল, তবু উন্মাদ কল্পনার বাঁধভাঙা জোয়ারে আমার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন আর অভিভূত হয়ে গেল। একটু-আগে-ধরানো সিগারেটটি ফেলে দিয়ে আমি আমার রগদুটো জোরে নিজের অজ্ঞাতেই চেপে ধরলাম। কেন জানি না, মনে হল আমার এই ব্যর্থতা শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও আমার ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার পরিচায়ক এটি। এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র সত্তা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমি যে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি, আমার ব্যক্তিসত্তা যে এক অবাস্তব শূন্যতায় নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে এমনি এক অবর্ণনীয় অনুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। আমি তো একজন অকর্মণ্য, দুর্বল, হেয় ব্যক্তি হিসেবে চিত্রিত হতে চাই নি। হয় তো বা এমনি অপদার্থ হয়ে থাকতে চাই নি বলেই বইয়ের মধ্যে আমার এই রূপটিই বড় হয়ে উঠেছে। এই আত্মচিত্রটির ওপরই মন এখন বড় বেশী করে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

নৈরাশ্যের তাড়নায় আমার শরীর হাল্কা হয়ে গিয়ে দমকা হাওয়ায় উড়ে-বেড়ানো ঝরা পাতার মতই ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নিজের চলাফেরা, নিজের চিন্তাধারা কোনো কিছুরই ওপর আর

আমার কর্তৃত্ব ছিল না। ডুবন্ত মানুষ যেমন করে একটা খড়কুটোকেও আশ্রয় করে বাঁচতে চায় তেমনি করে আমার এই মানসিক নৈরাশ্যের মধ্যে লীডার কাছে সান্ত্বনা পেতে চাইলাম আমি। চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কখন যে আমি আমার পড়ার ঘর থেকে নেমে এসে ওর দরজায় দাঁড়িয়েছি মনে নেই। দরজায় টোকা দিতে গিয়ে দেখি পাল্লাগুলো ঈষৎ খোলা, একটু যেন সাবধানতা অবলম্বনের জন্যই ওরকম করে পাল্লাগুলো রাখা হয়েছে মনে হল। দুবার টোকা দিয়ে অপেক্ষা করার পরও যখন সাড়া পেলাম না তখন বাধ্য হয়ে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে বড় আলোটা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই নজরে পড়ল অব্যবহৃত বিছানার ওপর স্ত্রীর সান্ধ্য পোশাকটি ছড়ানো রয়েছে। ভাবলাম ঘুম আসেনি বলে বোধহয় বাগানে নেমে গেছে। কিন্তু এ ভাবে একা গেল কেন? আমাকে ডাক দিতে পারত, এসব ভেবে একটু বিরক্তও হলাম আমি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম প্রায় তিন ঘণ্টা আগে ও আমার লেখার পাতায় চুম্বন চিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছে। এর মধ্যে কিন্তু ঘটনা প্রবাহ এত দ্রুতবেগে আবর্তিত হয়েছে যে আমার মনে হল সে মাত্র আধঘণ্টার ব্যবধান। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম নীচে।

ভাবলাম বসবার ঘরেই হয়তো পাব ওকে। লাল নীল কাচের পাল্লাগুলোর ওপর আলো পড়তে মনে হল গোটা বাড়ীটাই জেগে উঠেছে। সেখানেও কিন্তু লীডা ছিল না। যে বইটা ও পড়ছিল সেটা উপুড় করে রাখা আর পাশের ছাইদান লিপষ্টিকের রঙমাখা লম্বা লম্বা সিগারেটের টুকরোয় ভর্তি। জানালা খোলা তবু ঘরের মধ্যে সিগারেটের গন্ধ। বেশ বুঝলাম সে এইমাত্র বাগানে নেমে গেছে। ওকে সামনের খোলা যায়গায় ধরে ফেলা শক্ত নয়।

কাঁকরবাঁধানো রাস্তার ওপর চাঁদের আলোয় গতরাত্রের কথা মনে পড়ল। হতাশা আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক ধরনের আবেগে মনে হল

কালকের অপূর্ণ কামনা আজ তৃপ্ত করব। আলোয় উদ্ভাসিত নিদ্রামগ্ন গ্রামের প্রান্তে ফসল-মাড়ানো মঞ্চের ওপর ওর কাছে প্রেম নিবেদনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল আমার। অজস্র শিলাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর সরল কৃষক যেমন করে তার স্ত্রীর আলিঙ্গনেব মধ্যে সান্ত্বনা সন্ধান করে, তেমনি ভাবে আমার এ চিন্তাকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তই মনে হলো। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ হয়ে যাবার পব একজন সাধারণ মানুষের পর্যায়েই এখন আমাকে ফিরে যেতে হবে। আজ এই রাত্রির অবসানে আমি আমাব রূপবতী স্ত্রীর প্রেমে মগ্ন একজন সাধারণ শিক্ষিত মানুষ হিসেবেই পরিচিত হব। আমার আচরণ হবে সুন্দর আর নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে ধারণা থাকবে স্বচ্ছ। স্ত্রীর সান্নিধ্যেই আমার কাব্যিক আবেগ পরিতৃপ্ত হবে, রচনার ব্যর্থ চেষ্টায় নয়। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে যে সব ব্যর্থ পুরুষ তাদের পত্নীদের প্রীতি সাধনে মগ্ন হয় তাদের ওরা নিশ্চয় ভালবাসে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে মাথা নীচু করে যখন চলেছি তখন হঠাৎ চোখে পড়ল লীডা গাড়ি চলা রাস্তার বাঁকটি ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওর সোনালী চুল আর কাঁধ-খোলা সাদা জামাটা চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠল। বেশ বুঝলাম খামার বাড়িগুলোর ওপাশে সেই ফসল-মাড়ানো মঞ্চটার দিকেই ও চলেছে। ওই মঞ্চটার ওপরই ওর কাছে প্রেম নিবেদন করতে চাই আমি। তাই আমিও ওই রাস্তা ধরে দ্রুত বেগে এগিয়ে চললাম। একটু গিয়ে দেখি পার্ক আর ক্ষেতগুলোর মাঝখান দিয়ে যে ছোট রাস্তাটা বড় রাস্তার দিকে গিয়েছে ও সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। একবার ভাবলাম ডাকি, আবার ভাবলাম তার চেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে ওকে ধরে ফেলা আর চমকে দিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরাই ভাল।

আমি ছোট রাস্তাটায় গিয়ে পড়তে দেখি ও বড় রাস্তা পেরিয়ে খামারবাড়ির পাশ কাটিয়ে ছোট খাদটার তলা দিয়ে প্রায় দৌড়ে

চলেছে। গাছের অন্ধকারের ফাঁকে হঠাৎ চাঁদের আলোতে ওর মুখখানা দেখে আমার কেমন যেন অদ্ভুত লাগল। ততক্ষণে আমিও খামারবাড়িগুলোর পাশে গিয়ে পড়েছিলাম। আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না তবু কেমন যেন একটা অশুভ পূর্বাভাসে আমি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। লীডা ততক্ষণে সেই মঞ্চের কাছে গিয়ে তার ওপর ওঠবার চেষ্টা করছিল। ওখানে আগের মতই কয়েকটা খড়ের স্তূপ ছিল। লীডার শ্রম-ক্লান্ত মুখ, চকচকে চোখ আর আন্দোলিত দেহের দিকেই আমি তাকিয়ে ছিলাম। ও তখন খাড়া মঞ্চটায় ওঠবার জন্য প্রবল চেষ্টা করছিল। পিছলে আসার সময় ঝোপগুলোকে আঁকড়ে ধরে ও বার বার যেভাবে ওখানে ওঠার চেষ্টা করছিল তাতে খাবারের খোঁজে ছাগলদের পাহাড়ে চড়ার চিত্রটিই আমার মনে আসছিল। ও যেই ওপরে উঠেছে অমনি ছায়ার আড়াল থেকে একটি মানুষ বোধহয় ওর হাত ধরে তুলে নিল। ওকে সোজা দাঁড় করাতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই চিনলাম লোকটি এন্টোনিও।

সব কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমি। মনে হল শরীরটা শীতল হয়ে আসছে আমার। তবু বিস্মিত না হয়ে পারলাম না যে আমার এই স্ত্রীকে একটু আগেও আমি চিনতে পারিনি, যখন ওর ঘরে গিয়ে ওকে খুঁজে পাইনি, তখনও না। মাত্র তিন হপ্তা আগে এই নাপিতটিকে তাড়িয়ে দেবার অনুরোধ লীডাই আমাকে জানিয়েছিল। বিস্ময়ের গভীরতা আর নির্মম মানসিক যন্ত্রণায় আমার দম বন্ধ হয়ে এল। আত্মসম্মানের খাতিরে ওদিকে তাকাতে মন চাইছিল না তবু এ দৃশ্য দেখার প্রবৃত্তিটুকু এড়াতে পারলাম না। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত এই মঞ্চটিকে একটি রঙ্গমঞ্চই মনে হল আমার। দেখলাম মানুষটি সোজা দাঁড়িয়ে হাত ধরে লীডাকে আকর্ষণ করছে নিজের দিকে আর লীডা বেঁকে হুমড়ে গিয়ে বাধা দিতে চাইছে। বহুবার বহুঘটনাকে কেন্দ্র করে যে অদ্ভুত মূক ভাবগভীর মুখ-বিকৃতি লীডার দেখেছি, এখন যেন সেই ছবি ওর মুখে ফুটে উঠেছে। ঘৃণা আর

কামনার মিশ্রণে ওর মুখ আধ-খোলা, চোখছুটি বিস্ফারিত আর চিবুকটি সামনের দিকে বিস্তৃত। বিশেষ এক নৃত্যভঙ্গীতে ওর শরীরটি যেভাবে মোচড় খাচ্ছিল তাতে তার মুখের সেই বিশেষ বিকৃতিই লক্ষ্য করলাম।

এণ্টোনিও ওর দিকে লীডাকে টেনে আনতে চাইছে আর লীডা মৃহু বাধা দিচ্ছে, এরই ভেতর এক সময় পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ও। এই দৃশ্য দেখে আমারও একটি নাচের কথা মনে হল। ওরা উভয়ে ওই ভাবে পরস্পরকে টানাটানি করে চলেছে আর আমার মনে হচ্ছে ওরা মিনুয়েট নেচে চলেছে। লীডার হাত ছিল এণ্টোনিওর বুকের ওপর আর এণ্টোনিওর হাত ছিল ওর কোমরে জড়ানো। চাঁদের মদির আলোতে আমার বেশ মনে হল ওই জোড়াটি যেন নাচের মহড়া দিচ্ছে, পুরুষটি দাঁড়িয়ে আছে সোজা, আর নারীটি অর্ধবৃত্তাকারে ওর চারদিকে ঘুরে চলেছে। সঙ্গীত আর নির্দিষ্ট কোনো নৃত্যের কানুন না থাকলেও এ নৃত্যের নিজস্ব উন্মাদনাময় একটা ছন্দ ছিল বৈকি! শেষ পর্যন্ত লীডা বা এণ্টোনিও যে কেউ একজন অন্যের ভারসাম্যটি নষ্ট করে দিলে আর উভয়ে একটি খড়ের স্তূপের আড়ালে হারিয়ে গেল।

পনেরো

ওদের আর না দেখতে পেয়ে আমার খুবই খারাপ লাগল। খড়ের স্তূপদুটোর মাঝখানে শূন্য মঞ্চে চাঁদের উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দুটি প্রাণীকে ঐ মঞ্চের ওপর চন্দ্রালোকে নাচতে দেখে আমি যেন কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম যে একজন আমার স্ত্রী লীডা অন্যজন একজন নাপিত। মনে হয়েছিল চন্দ্রের সমারোহময় কিরণের মধ্যে দুটি নৈশ আত্মা কোনো এক জাদুমন্ত্রে একত্রিত হয়েছে। ঘটনা প্রবাহে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম ঠিকই তবু সমস্ত ঘটনার একটা বিচ্ছিন্ন রূপ চিন্তা করে নিজেকে সংযত করতে চাইলাম। যাই হক আমার সৌন্দর্যবোধের চরম পরীক্ষা হয়ে গেল, আর এই অনুভূতিই আমাকে রক্ষা করল। এই মঞ্চের ওপর গত রাত্রে শান্ত নীরব পরিবেশে প্রেম নিবেদনের যে আবেগ আমার মনে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল তার মধ্যে যে চরম সত্য ছিল তা স্পষ্ট হয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে শুধু নায়কের পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। আলিঙ্গন আমি করি নি বটে, কিন্তু ওর মধ্যে যে সৌন্দর্য ছিল তাকে অস্বীকার করব কী করে?

আমার আহত গর্ব শেষ অবলম্বনের জন্য এই বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাকে আশ্রয় করছে এমনি একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল আমার মনে। মন বললে, ঘটনার যে-কোনো অর্থই আমি করি না কেন আমার স্ত্রী যে আমাকে বঞ্চনা করেছে আর এই বঞ্চনা একটা নাপিতকে আশ্রয় করে, একথা অস্বীকার করব কী করে? এন্টোনিওর বাহুবন্ধনে লীডাকে দেখার পর থেকে এই প্রথম বুঝলাম যে আমাকে একজন এমন স্বামীর ভূমিকা নিতে হয়েছে' যার স্ত্রী অসতী। নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করলাম। কিন্তু আমাকে যুক্তিনিষ্ঠ থাকতেই

হবে। এইটিই আমার ভগবৎ নির্দিষ্ট কর্ম, স্ত্রীর প্রবঞ্চনাও এ থেকে আমাকে বিরত করতে পারবে না। এণ্টোনিও আর আমার স্ত্রীর মধ্যে যে ঘটনা ঘটে গেল তারই কথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে দ্রুত চলে এলাম আমি।

এণ্টোনিও যে অসচ্চরিত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এও সম্ভব যে সূত্রপাতে স্ত্রীর সঙ্গে ওর প্রথম সংস্পর্শ নিতান্তই আকস্মিকভাবে ঘটেছিল, ইচ্ছাকৃত নয়। ঐ একই ভাবে বলা যায় যে লীডা যাকে নাপিতের দিক থেকে সৌজন্যের অভাব বলে তার প্রতি অবিমিশ্র ঘৃণা প্রকাশ করেছিল তাও ছিল অকৃত্রিম। হয়তো বা ওই প্রবল ঘৃণার আড়ালে অবচেতন মনের আকর্ষণ আর উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল ওর। এখন বুঝলাম নাপিতটিকে তাড়িয়ে দেবার প্রস্তাব ক'রে ও নিজেকেই রক্ষা করতে চেয়েছিল। আমি কিন্তু নির্বোধের মত কিছু না বুঝে শুধু স্বার্থপরের মত নিজের অসুবিধার কথাই চিন্তা করেছি। লীডা কিন্তু যেমনি নিজের মনটিকে বুঝতে পারেনি তেমনি ধরতে পারেনি আমার স্বার্থচিন্তাকে। ও নিতান্ত স্নেহ আর সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ওটা নিয়ে জিদ করেনি। যে মানুষ ওকে অপমান করেছে অথচ যার প্রতি ও ভেতরে ভেতরে আকৃষ্ট সেই মানুষ প্রত্যহ এ বাড়িতে এসেছে, লীডাও তা সহ্য করে গেছে নির্বিবাদে। আমার লেখার কাজটিকে শেষ করার স্বার্থে আমাদের একটা কপট চুক্তি দিয়ে নিজেদের মানসিক বিভেদ আর দৈহিক আবেগকে আমরা ঢেকে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে এই যে আমাদের বিভেদ আর আবেগ চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করেছে। তিন হপ্তায় কাজ আমার শেষ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এরই মধ্যে লীডার ভেতর আবেগ চরম পর্যায়ে এসে গেছে। যেটুকু আর দরকার ছিল তা হল আমার একবার শহরে যাওয়া। ঠিক সেই দিনই লীডা তার প্রথম ঘৃণার স্বরূপটি বুঝেছে।

এণ্টোনিও সেদিন এসে আমার দেখা পায় নি। তারপর সিঁড়িতে

উভয়ের দেখা হবার সময় হয় এণ্টোনিও প্রবলভাবে এগিয়ে এসেছে নয় তো লীডাই এগিয়ে এসেছে আগে। যাই হক হঠাৎ তাদের মধ্যে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে, আর লীডার ব্যবহারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা ভারী পাথরের টুকরোর মত যেটাকে জলে ফেললে নিজের ওজনেই নদীর তলায় গিয়ে পৌঁছয়। যে মঞ্চের ওপর আমি লীডাকে আমার কামনার দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে দেখতে চেয়েছিলাম, হয়তো একধরনের নিষ্ঠুরতায় লীডা সেই মঞ্চের ওপরই এণ্টোনিওর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যে স্ত্রী এখনও তার স্বামীকে ভালবাসে তার কথা ছেড়ে দিলেও একজন শত্রু, যার কিছু পরিমাণ বিবেকবুদ্ধি আর রুচিশীলতা আছে সেও বোধহয় এমনি এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে না। কারণ সকালে এণ্টোনিওর চলে যাবার পরের কাজগুলো লীডা বেশ চালিয়ে গেছে। সে জানত গভীর রাত পর্যন্ত আমি কাজ করব আর এও জানত যে ঐ সময় নিশ্চিন্তভাবে সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে যেতে পারবে। ফাঁদে পড়া ইঁদুরকে নিয়ে বিড়াল যেমন করে খেলায়, ও তেমনি করে আমাকে অ্যালপিনিতে অফিসারের সঙ্গে প্রেমের গল্প শুনিয়েছিল। আসলে সকালবেলায় এণ্টোনিওর সঙ্গে সাক্ষাতের ইঙ্গিতই সে দিয়েছিল। খেতে বসার সময় নিজের অশোভন আকুলতা সে ঢেকে রাখতে পারে নি—এমনকি বড় একটা প্রশংসনীয় গুণ না হলেও আচরণের শালীনতা রক্ষার জন্য যেটুকু কপটতা করা যেত তাও করেনি। ওর এক ক্ষুধা যে অন্য ক্ষুধার তাড়নায় কমে গিয়েছে এটুকু আমি বুঝতে না পারলেই ওর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পাছে আবার ওর অসুস্থতার ভানকে আমি সত্যি বলে ধরে নিই আর ওর ঘরে রাত্রি যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করি তার জন্য ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওটাকে অন্য প্রকারের দৈহিক অসুস্থতা বলেই ইঙ্গিত করেছিল। আমি পড়ার ঘরে নিজেকে বন্ধ করার পর ও নীচে বসবার ঘরে তিন ঘণ্টা ধরে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়েছে আর বিশেষ একটি মুহূর্তের

প্রতীক্ষা করেছে। এরপর সময় যেই এসেছে অমনি ও দৌড়ে গেছে তার কথা রক্ষা করার জন্য। তারপর তার সেই নৃত্য যার একমাত্র দর্শক ছিলাম আমি, তার ভেতর তার অবদমিত আসঙ্গলিপ্সাই ফুটে উঠেছে।

স্বীকার করব যে লীডার সারা ব্যবহারের মধ্যে একটা বঞ্চনাময় সাময়িক কর্মপ্রচেষ্টাই দেখলাম। মরুভূমির নদীর মত এই কামনা মনের গভীরতা থেকে জন্ম নিয়ে ছুটে চলে, আবার একটু পরে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অন্য দিক দিয়ে বলা যায় যে ওর এই কাজের মধ্যে সামাজিক রীতিভঙ্গের একটা অনিচ্ছাকৃত প্রয়াস দেখলাম মাত্র। এণ্টোনিওর সঙ্গে ওর এই এক রাত্রির গুপ্তপ্রণয় যে শেষ হয়ে গেল এ কথা ভেবে নেবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার সঙ্গে দীর্ঘ এক বৎসর ধরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ওর তার ধরনই পৃথক, তাই এ কথা ভেবে নেওয়া যায় যে ঐ স্বল্পকালীন গুপ্তপ্রণয় আমাদের সম্পর্ককে মোটেই ক্ষুণ্ণ করবে না। আমি যদি এ সম্বন্ধে লীডাকে কিছুই জানতে না দিই তবে হয়তো ও আরও বেশী করেই পূর্বের চেয়ে ভালবাসবে আর এণ্টোনিওর হাত থেকে মুক্ত হবার পথ নিজেই করে নেবে। কিন্তু আমার মনে হল এই চিন্তাধারা আমারই অক্ষমতা, দুর্বলতা আর নমনীয় চরিত্রের পরিচায়ক। আমার মন বিষাদে মগ্ন হয়ে গেল। স্নেহ আর সদিচ্ছার মুক্তপথে যেন আমার ওপর সৃজনীশক্তি আর স্ত্রী-সৌভাগ্য বর্ষিত হয়েছিল। এই করুণার দানে বড় জোর বাক্-সর্বস্ব একটা সাহিত্যকর্ম আর ঈষদুষ্ণ সতীত্বের মৃদু স্পর্শ পাওয়া যায়, কবিতা বা যথার্থ প্রেম পাওয়া যায় না। আমার জন্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি তো নয়ই, মঞ্চের ওপর নৃত্যও নয়; আজ থেকে এক অতি সাধারণ জীবনে নির্বাসিত হয়ে গেলাম আমি।

দুঃখের বায়ুপ্রবাহে তাড়িত হয়েই যেন ইতিমধ্যে আমি কখন পার্ক পেরিয়ে ঘরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিজের পড়বার ঘরে এসে বসেছি টের পাইনি। একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ওর ওপর লিখলাম 'প্রিয়তম

লীডা'। ওর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চূড়ান্ত ভাবেই শেষ করে ফেলার জন্য চিঠিটি লিখতে চলেছিলাম আমি। হঠাৎ দেখলাম আমি,কাঁদছি।

কতক্ষণ আমি কেঁদেছিলাম তা আমার মনে নেই, তবে চিঠিটি লেখার সময় চোখের জল পড়ে সমস্ত লেখা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ওই চিঠিতে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমাদের মধ্যে আর কোনো সম্বন্ধই নেই। এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াই আমাদের পক্ষে শুভ। কিন্তু এই কথাকটি লিখতে গিয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম আমি। সমস্ত শরীর যেন এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অজস্রধারায় অশ্রুজল ঝরিয়ে চলেছিল। বুঝলাম ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। সে প্রবঞ্চনা করেছে, অপরকে ভালবেসেছে আর আমার জন্য শুধু এককণা স্নেহ বাকী রেখেছে কি-না তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ওকে আমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে জীবনটা কেমন হবে সে কথা একবার ভাববার চেষ্টা করলাম। আত্মহত্যার কথা বহুবার ভেবেছি এর আগে, কিন্তু এবারই বোধহয় তার লগ্ন এসেছে আমার জীবনে। যাই হক অজস্র অশ্রুধারার মধ্যেই চিঠি লেখা শেষ করে সই করে দিলাম তলায়। কী লিখেছি পড়তে গিয়ে দেখি চোখের জলে সব কিছু অস্পষ্ট হয়ে গেছে আর মনে হল এ চিঠি লীডার কাছে পাঠানোর সাহস আমার কোন দিনই হবে না।

অকপটে স্বীকার করব যে সেই বিশেষ মুহূর্তে আমার মধ্যে অক্ষমতা আর স্বার্থপরতার ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। একটি রাত্রের ঘটনায় আমার বহু অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। এবার যদি আমি চেষ্টা করি তবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত করতে না-পারলেও, বহুলাংশে সংশোধিত করে স্বাভাবিক স্বভাবের মানুষ করে গড়ে তুলতে পারি। এই নতুন চিন্তা আমাকে বেশ শান্ত করে তুলল। টেবিল থেকে উঠে শোবার ঘরে গিয়ে লাল হয়ে ফুলে ওঠা চোখগুলোকে ধুয়ে জানালায় এসে দাঁড়ালাম।

ওখানে প্রায় মিনিট দশেক দাঁড়িয়েছিলাম আমি, কিন্তু এই সময়টুকুতে কোনো কিছুই চিন্তা করিনি। মনে মনে আমি কামনা করছিলাম, রাত্রির অচঞ্চল এই নিস্তব্ধতা আমার মনে শান্তি এনে দিক। যাই হক লীড্রার কথা আমি মোটেই ভাবিনি তাই ওকে সামনের খোলা জায়গা দিয়ে দৌড়ে ঘরের দরজার দিকে আসতে দেখে বেশ বিস্মিত হলাম। জোরে ছুটে আসার সুবিধের জন্য ও তার পোশাক উঁচু করে তুলে ধরেছিল। চাঁদের আলোয় বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে ওর সেই ছুটে আসার দৃশ্য দেখে মনে হল ও যেন একটা নিরীহ শেয়াল বা বেজী যেটা চুরি করে মুরগীর বাচ্চা মেরে রক্ত মাখা গায়ে চুপি চুপি গর্তের • দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। এই অনুভূতিটি এত প্রবল হয়ে উঠল যে আমার চোখে ও যেন সত্যিই একটা বন্য জন্তু হয়ে গেল, আর ওর মধ্যে সেই বন্য স্বভাবের দিকটা যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল। একটু স্নেহের হাসি না হেসে পারলাম না আমি। ছুটতে ছুটতে যেই ও ওপরের দিকে তাকিয়েছে অমনি আমার চোখে চোখ পড়ল ওর। মাথাটা নামিয়ে নিয়ে ও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি ওর মধ্যে কেমন যেন একটা অশুভ দৃশ্যের ছায়া দেখে জানালা থেকে সরে এসে আমার সোফায় বসে পড়লাম।

ষোল

একটু পরেই দরজা খুলে ঝড়ের মত ঘরে এসে ঢুকল লীডা। ওর আক্রমণমুখী ভঙ্গি দেখে বুঝলাম নিজেকে রক্ষা করতেই চাইছে ও। একটু না হেসে পারলাম না। দরজার হাতল-ধরা অবস্থায় ও প্রশ্ন করল, 'কী হচ্ছে, কাজ করছ না ?'

মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম, 'না'।

কোনো কৈফিয়তই আমি চাইনি ওর কাছে, তবু কৈফিয়তের সুরে ও বলে উঠল, 'ঘুমোতে না পেরে একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম পার্কে। কিন্তু তোমার কী হয়েছে বলত ?'

ইতিমধ্যে টেবিলের দিকে একটু এগিয়ে এলেও একেবারে কাছে আসার সাহস হচ্ছিল না ওর। টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজগুলোর দিকে ও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আমি একটু চেষ্টা করে বললাম, 'আজ রাত্রে আমি একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছি। এই আবিষ্কারের মূল্য আমার জীবনে অনেকখানি।'

তাকালাম ওর দিকে। ও ভুরু কুঁচকে, হয়তো বা একটু ক্রোধের সঙ্গেই টাইপরাইটারটার দিকে তাকিয়ে ছিল। গলা একটু চড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'কী আবিষ্কার শুনি ?'

আমার পরবর্তী কথার জবাব দেবার জন্য যে ও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে এটা বেশ বুঝতে পারলাম। এক ধরনের পোকা দেখা যায় যারা বিপদের সময় ভয় দেখানোর জন্য পেছনের পাগুলোকে উঁচিয়ে ধরে। জীববিজ্ঞানীরা এই ধরনের ভঙ্গিকে 'স্পেকট্র্যাল' বা আজগুবি ভঙ্গি বলে থাকেন। ওর আচরণে আমার সেই পোকাগুলোর কথাই মনে পড়ল। আমি যেন ওকে বলতে শুনলাম, 'হ্যাঁ, আমি

নাপিতটাকেই আমার দেহ দান করেছি—ওকে আমার ভাল লাগে,—এবার তো সব বুঝলে, যা ভাল মনে হয় তাই কর।' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, 'আবিষ্কার করলাম যে লেখাটা কিছুই হয় নি, লেখক আমি কোনো দিনই হতে পারব না।'

ও চুপ করে দাঁড়িয়েই রইল, ও ঠিক যে কথা শুনবে ভেবেছিল তার বদলে এই ধরনের কথাগুলোকে যেন একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতেই গ্রহণ করল। ওর কণ্ঠস্বর থেকে তখনো উগ্রতা চলে যায়নি, তেমনি ভাবেই ও প্রশ্ন করল, 'তুমি কী বলতে চাও ?'

শান্তভাবেই বললাম, 'সত্যিকথাই বলছি লীডা। নিজেকে বঞ্চনা করেছি এতকাল। ভেবেছিলাম একটা মহৎ সাহিত্যকীর্তি রেখে যাচ্ছি। কিন্তু যা হয়েছে তা একটা বন্ধ্যা সৃষ্টি। আমি একজন হতভাগ্য প্রতিভাহীন সাধারণ মানুষ মাত্র।'

নিজের কপালের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে ও আমার কাছে এসে বসল। যে অপ্রত্যাশিত সুকঠিন নতুন ভূমিকায় ওকে এবার অভিনয় করতে হবে তারই জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বলল, 'এ কী করে হয় সিলভিও ? তুমি তো এক রকম নিশ্চিত ছিলে।'

'এবার ঠিক বিপরীতটায় নিশ্চিত আমি' বলে চললাম, 'আর তা ছাড়া এবার এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস এত দৃঢ় যে আত্মহত্যার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।'

কথার শেষে চোখ তুলে ওর দিকে তাকালাম আমি। বুঝলাম আমার রচনার কথা যতক্ষণ বলে চলেছিলাম ততক্ষণ ওর কথাই ভেবেছি আমি। রচনা নিরর্থক হয়ে গেছে তাতে আমার কিছুমাত্র আসে যায়না, কিন্তু ওর সারা গায়ে এণ্টোনিওর ভোগ চিহ্ন দেখে অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, এমনকি চুলের মধ্যে দুএক টুকরো খড় তখনও লেগে রয়েছে। ওর মাথার সেই ফুলের গুচ্ছটি বোধহয় এখনও সেই মঞ্চের ওপর পড়ে থাকবে। তাড়াতাড়িতে ঠোঁটে একটু রঙ লাগিয়ে আসতে ওর বিবর্ণ

মুখখানা আরও বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে। পড়ে গিয়ে ওর হাঁটুর ওপর একটু মাটি লেগে রয়েছে, আর পোশাকটায়ও ভাঁজ ধরে গেছে।

মনে হল ওই দৈহিক অবস্থার কথা ও জানে, আর ইচ্ছে করেই ওই অবস্থায় আমার কাছে এসেছে। না হলে সে তো অনায়াসেই মুখ হাত ধুয়ে পোশাক বদলে আমার কাছে আসতে পারত। কথা-গুলো ভাবতেই আমি আবার নতুন করে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম। মনে হল ওর এই নির্মম, একরোখা প্রতিকূলতার সব অর্থই বুঝতে পেরেছি। ও ততক্ষণে বলে চলেছিল, 'আত্মহত্যা? আচ্ছা পাগল তো। একটা গল্প ঠিকমত উতরোয়নি বলে?'

অন্তরে ওর কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হল। মনে হল ওই যেন বলছে নিজেকে, 'মুহূর্তের নীতিভ্রষ্টতার জন্য চলমান লোভ সংবরণ করতে পারিনি বলে?' মুখে বললাম, 'আমার কাছে কিন্তু এই কাহিনীর মূল্য ছিল অনেক, আমি ব্যর্থ হয়ে গেছি....আর আমার এই ব্যর্থতার নিদর্শন বহন করছে এই পাণ্ডুলিপি।' কথাগুলো বলতে বলতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবেই অত্যন্ত রূঢ়তার সঙ্গে আঙুল দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি না দেখিয়ে ওকেই নির্দেশ করলাম।

সবটুকু এবার ও বুঝতে পারল (হয়তো-বা আগেই বুঝেছিল কিন্তু চেষ্টা করছিল আমাকে প্রতারণা করতে) আর বিভ্রান্ত অবস্থায় চোখগুলোকে নামিয়ে নিল। হাঁটুর ওপরে মাটির কলঙ্কটুকু ঢেকে ফেলার জন্য কোলের ওপর থেকে হাতটাও ওর নেমে গেল। দেহগত প্রেম যখন ক্ষীয়মাণ তখন প্রয়োজন হয় কতকগুলো বহিরঙ্গ প্রেরণার। ইন্দ্রিয়গত ক্লান্তি আর বহিরাবরণের বিশৃঙ্খলাকে মানিয়ে নিয়ে প্রেমময়ী পত্নীর ভূমিকায় অভিনয় করতে বেশ বিপন্ন বোধ করছিল লীডা। আশঙ্কা হচ্ছিল হয়তো অবান্তর কোনো মন্তব্য আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। স্থির করলাম এবার সত্য কথাটাই পাড়ব। এমন সময় শুনলাম কম্পিতকণ্ঠে লীডা আমাকে প্রশ্ন করছে, 'কেন

তুমি ব্যর্থ হয়ে সিলভিও? কাজের মধ্যে তুমি কি আমার কথা চিন্তা করনি?'

ওর কথায় বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। চতুরতা আর ধৃষ্টতার বাইরে এবার কিন্তু ওর কথার মধ্যে এমন একটা স্নেহস্পর্শ ছিল যার প্রশংসা না করে পারলাম না। ওর কথার উত্তরে ফিরে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কী করতে পার আমার জন্য? আমার মধ্যে যে সৃজনীশক্তির অভাব তা বোধহয় তুমি পূর্ণ করতে পার না।'

অকৃত্রিম সরলতায় ও উত্তর দিল, 'তা নয় অবশ্যই, তবে আমি তোমাকে ভালবাসি।'

ওর সাম্প্রতিক উত্তেজনা কমে আসার দরুন চোখগুলো ক্রমশ স্বচ্ছ আর উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল। বেশ বুঝলাম ও তার পূর্বশক্তি ফিরে পাচ্ছে। এমনি সময় হাতটা ও আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমিও তার হাতটিতে চুমু খেয়ে নিজের কোলের ওপর রেখে মৃদু স্বরে বললাম, 'আমিও তোমায় ভালবাসি লীডা, আর তা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আমার ভয় করছে, ওইটুকু সম্বল করে বেঁচে থাকা বোধ হয় আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে।'

ওর যে পাগুলোকে কামনার উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ আগে মঞ্চের ওপর নৃত্য করতে দেখেছিলাম তারই ওপর মুখ চেপে ধরলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর কথাগুলোর একটা বিশেষ অর্থ ফুটে উঠল আমার মনের মধ্যে, 'উদগ্র কামনার তাড়নায় অন্যায় করে ফেলেছি আমি, তার চেয়েও কিন্তু বড় কথা, আমি তোমাকে ভালবাসি। সত্যিই আমি দুঃখিত, এমন কাজ আর আমি কক্ষণো করব না।'

শেষ পর্যন্ত যা ভেবেছিলাম তাই হয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম ওর দিক থেকে স্নেহ প্রেমের পরিমাণ যত অল্পই হক না কেন তাও অগ্রাহ্য করবার মত শক্তি আমার নেই। ওদিকে লীডা তখনও বলে চলেছিল 'যখনই তুমি হতাশ বোধ করবে তখনই আমার কথা ভাববে সিলভিও।

যাই হক না কেন, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি আর এই ভালবাসার একটা মূল্য আছে বই কি !'

অত্যন্ত কোমল স্বরে বললাম, 'তোমার কথা ভাবব ? কিন্তু তুমি কি আমার কথা ভাব লীডা ?'

'সব সময় ।'

ভাবলাম, নিশ্চয় ও মিথ্যা কথা বলছে না। হয়তো সব সময় এমনকি একটু আগে ফসল-মাড়ানো মঞ্চের ওপর এন্টোনিওকে সর্বস্ব দান করার সময়টিতেও, ও আমার কথা ভেবেছে। যেভাবে প্রবল বঞ্চনার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন সে আমার চোখের সামনে আজ তুলে ধরেছে তাতে সে যে আমার কথা ভাবে এ কথা স্বীকার করতে কষ্ট হওয়াই উচিত ছিল আমার। তবু মানুষ যেমন করে একটা কঠিন সমস্যার কথা সব সময় মনের মধ্যে রেখে কাজকর্ম করে যায়, ঠিক তেমনিভাবে ও আমার কথা সারাক্ষণ মনের মধ্যে ধরে রেখেছে, এই কথাই মনে হল আমার। ও যে আমার ওপর সদিচ্ছার বশেই এসব কথা বলছে এতে আমার সন্দেহ ছিল না, আর তাছাড়া ওই সদিচ্ছা-টুকু বাদ দিলে পর সবটুকুই আমার কাছে অন্ধকার, এমনকি এন্টোনিওর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার কারণটুকুও। আমরা পরস্পর বিপরীত দিক থেকে কথা বলছিলাম। কারণ আমার কাছে ওর ওই সদিচ্ছাটুকুর বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। এই সদিচ্ছার ভিত্তিভূমি হল যুক্তি আর সাধারণ বুদ্ধি। আমার কাছে কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তিরই মূল্য ছিল, কারণ এর অনুপস্থিতিতে প্রেম বা সাহিত্যকীর্তি কোনো কিছুই জন্ম নিতে পারে না। ও কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির চেয়ে সদিচ্ছা বা মঙ্গল কামনার ওপরই জোর দিতে চাইছিল। যার মধ্যে যে গুণের অভাব সে গুণটিকেই সে বেশী করে শ্রদ্ধা করে। ওর মধ্যে বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তির প্রাচুর্য ছিল তাই ও পরিচ্ছন্ন যুক্তিনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এদিকে আমার মধ্যে প্রাণহীন যুক্তিবত্তার আধিক্য থাকায় প্রাণবন্ত প্রবৃত্তির ওপর আমি শ্রদ্ধাবান। নিজে নিজেই যেন উচ্চারণ

করে চললাম, 'কিন্তু শিল্প কি কেবল মাত্র সদিচ্ছার প্রভাবে সৃষ্টি হতে পারে ?'

ও আমার মাথায় আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছিল। আমার কথা শোনেনি, তবু যেন শুনেছে এমনি ভাবে অত্যন্ত দরদের সঙ্গেই বলে উঠল, 'ঠিক আছে, উঠে পড়ত, কাপড় চোপড় ছেড়ে আমি বিছানায় যাব আর তুমি তোমার লেখাটি আমাকে পড়ে শোনাবে। দেখা যাক রচনাটি সত্যিই খারাপ কি না।'

কথা বলতে বলতেই ও উঠে দাঁড়ালো। আমার তখন একরকম বিভ্রান্ত অবস্থা। ওকে বলতে চাইলাম যে লেখাটি খুবই খারাপ হয়েছে আর ওটা নিয়ে করার কিছুই নেই। ও আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা বলতেই দিলে না। নিজেই আবার বলে উঠল, 'একটিও কথা না, এসো দেখি। এত তাড়াতাড়ি করে কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। আমি আমার ঘরে যাচ্ছি—তুমি শীগগীরই আমার কাছে চলে আসবে, কেমন ?' ওর এই কথার উত্তরে কিছু বলার আগেই ও ঘর ছেড়ে চলে গেল।

ওর আন্তরিক সদিচ্ছা যে আবার প্রবল হয়ে উঠছে তাতে কোনো সন্দেহ রইল না। কে জানে হয় তো বা এই সদিচ্ছাই পরবর্তী লালসাকে জয় করতে পারে। সে উত্তর কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত। যাই হক টেবিল থেকে পাণ্ডুলিপিটি তুলে নিলাম।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম আমি। একটু পরে মনে হল অনেকখানি সময় কেটে গেছে। পাণ্ডুলিপিটি হাতে নিয়ে ওর দরজায় ঘা দিতেই ও বেশ খুশি হয়েই আমাকে ভেতরে যেতে আহ্বান জানাল।

একটা জমকালো নৈশ পোশাক পরে ইতিমধ্যেই সে বিছানায় এসে বসেছিল। বিছানার মাথার দিকের ছোট আলোটা শুধু জ্বলছিল, তাই বাকী ঘরটুকু ছিল প্রায় অন্ধকার। স্বাগত সম্ভাষণের মনোরম ভঙ্গিতে সামনের দিকে হাতটি রেখে বালিশে ভর দিয়ে ও

বিছানায় বসেছিল। মুখের ভাবটি এখন খুবই সংযত ঠেকল আমার। ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত চুলগুলো গুছিয়ে নিয়েছে আর তার ওপর বাঁ দিকে গুঁজে দিয়েছে তাজা এক গোছা ফুল। এমনিতেই ও সুন্দরী। এখন যেন তার সেই সৌন্দর্যের মূল যে মোহময় মাধুর্য তাই আবার মুখে চোখে ফিরে এসেছে মনে হল। একটি কথা ভেবে, বিস্মিত না হয়ে পারলাম না যে এই সুন্দর মুখটিই কিছু আগে লালসার প্রবল তাড়নায় বিকৃত ভঙ্গিতে কুৎসিত-দর্শন হয়ে উঠেছিল। ও হেসে বলল, 'নাও, শুরু কর। দেখছ না, তোমার লেখা শুনব বলে আমি আমার সেরা সান্ধ্য পোশাক পরে এসেছি ?'

ওর বিছানায় একটু তির্যক ভঙ্গিতে বসে বললাম, 'তুমি পড়তে বলছ বলেই পড়ছি। আমি কিন্তু তোমাকে আগেই বলেছি যে লেখাটা একবারে উৎরোয়নি।'

'ঠিক আছে, পড়ে যাও, আমি শুনি।'

প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করলাম। আগাগোড়া গল্পটা পড়ে গেলাম একটুও না থেমে। তবে মাঝে মাঝে ও কেমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে তাই দেখবার জন্যে আড় চোখে চেয়ে দেখছিলাম। পড়ার পর আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হল না। বুঝলাম, বিষয়-বস্তুটি মন্দ নয়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। অবশ্য লেখাটাকে যতখানি মূল্যহীন আমি আগে মনে করেছিলাম, এবার পড়ার পর মনে হল তার থেকে কিছু বেশী মূল্য ওর রয়েছে। ধারণার এই স্বল্প পরিবর্তন অবশ্য এমন কিছু লক্ষণীয় নয়, কারণ এখন আমার কাছে আমার স্ত্রীর মন্তব্যই মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়ার শেষে কী ধরনের মন্তব্য ও করবে সেইটুকু জানার জন্যই আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল। দুটো মাত্র পথ ওর সামনে খোলা। হয় বলবে, সিলভিও, কেন তুমি অমন করে বলছিলে ? লেখাটি তো সুন্দর হয়েছে, অথবা বলবে, লেখাটি নিতান্ত মামুলীই হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পথটি যদি সে গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে সে নির্বিকার চিত্তে

বঞ্চনা করছে। গল্পটি ভাল হয়নি জেনেও সুন্দর হয়েছে বলে ঘোষণা করলে, এই কথাটিই প্রমাণিত হবে যে সে আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে স্বেচ্ছামত পরিচালিত করতে চায়; আর আমাদের মধ্যেকার সম্পর্কটি নিতান্তই করুণা আর মিথ্যাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় পথটি কিন্তু প্রেমের, আর সে প্রেম তার নিজের সদিচ্ছা আর স্নেহের মিশ্রণেই সৃষ্ট। যাই হক কোন্ পথটি সে বেছে নেবে তা দেখার জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায় বসে রইলাম। যদি সে বলে যে কাহিনীটি ভালই হয়েছে তবে আমি নিশ্চয় চেঁচিয়ে বলে উঠব, 'না, গল্পটি নিতান্তই বাজে আর তুমিও একটা দ্বিচারিণী ছাড়া কিছু না।'

আগাগোড়া এই কথা মনে মনে ভেবেই আমি গল্পটি পড়ে গিয়েছি আর যতই পড়া শেষ হয়ে এসেছে ও কী বলবে না বলবে ভেবে পড়ার গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত গল্পের সব শেষের বাক্যটি পড়েই ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, 'কেমন হল'।

আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, একেবারে নিস্তব্ধ নীরব। মনে হল প্রতারণার মনোভাব একবার ওর মুখের ওপর ছায়া ফেলে গেল। মুহূর্তের জন্য সত্যিই যেন ও ভেবে নিল যে রচনাটি ভাল হয়েছে এই মিথ্যা কথা বলে নিজের চতুরতা, হৃদয়হীনতা আর মিথ্যা করুণামিশ্রিত চাটুকারিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সে মেঘ কেটে গিয়ে সেখানে আমার প্রতি সত্য আর শ্রদ্ধাশ্রিত একটা প্রেমের ভাব ফুটে উঠল। নৈরাশ্যের আন্তরিকতায় ও বলে উঠল, 'তোমার কথাই বোধহয় ঠিক, যা চেয়েছিলে সেই মহৎ সৃষ্টি এটি হয়ে ওঠে নি। তবে তুমি যতটা খারাপ ভাবছ তা নয় কিন্তু, শুনতে তো বেশ ভালই লাগছিল।'

আশ্বস্ত হলাম আমি। আনন্দের সঙ্গে বললাম, 'ঠিক এই কথাই কি তোমায় আমি বলিনি?'

'লেখার ধরনটি কিন্তু চমৎকার হয়েছে,' বললে লীডা।

'কিন্তু ভাল করে লেখাটাইতো আর সব না।'

'আমার কী মনে হয় জান,' ও বলে চলল, 'এটা নিয়ে তুমি ঠিকমত কাজ কর নি। তুমি যদি দুএক বার নতুন করে লিখতে তা হলে শেষটা তোমার মনের মত হত।'

তখনও কিন্তু লীডা ভাবছিল যে প্রেরণার দানের চেয়ে সদিচ্ছার দানই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনীয়। আমি বললাম, 'আমি চাই আমার প্রেরণার অনুকূল শিল্প সৃষ্টি হক, আর পেছনে যদি সত্যিকার প্রেরণা না থাকে তবে কাজ করা বা তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানেই হয়না।'

ও হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়েই বলে উঠল, 'ঠিক ঐখানেই তোমার ভুল হচ্ছে। কাজটাকে তুমি মোটেই মূল্য দাও না আর কেবলই দুশ্চিন্তা কর। আসলে কাজ ঐভাবেই করতে হয়, কাজতো আর জাদুমন্ত্রে হঠাৎ হয়ে যায় না।'

আমরা আমাদের উভয়ের বিপরীত চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করে গেলাম। তারপর পাণ্ডুলিপিটাকে চার ভাঁজ করে পকেটে পুরে নিয়ে বলে উঠলাম, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে আর বেশী মাথা না ঘামানোই ভাল।'

একটু নীরবতার পর শান্তভাবেই বললাম, 'একজন অক্ষম লেখককে স্বামিরূপে পেয়েছ বলে কিছু মনে করো না যেন।'

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল ও, 'লেখক হিসেবে তোমাকে কক্ষণো ভাবিইনি আমি।'

'তাহলে কী ভেবেছিলে আমাকে ?'

'জানিনে,' হেসে বললে ও, 'কী করে বলব ? এখন অবশ্য তোমাকে চিনে ফেলেছি, তুমি যা তুমি তাই। তুমি কিছু লেখো আর না লেখো, তুমি আমার কাছে আগেও যা ছিলে এখনও তাই।'

'কিন্তু তোমাকে যদি একটা মতামত প্রকাশ করতে হয় তাহলে কী বলবে ?'

একটু ইতস্তত করে পরম আন্তরিকতার সুরে ও বলল, 'ভালবাসলে এ ধরনের মতামত প্রকাশ কেউই করতে পারে না।'

সে এই ভাবে তার নিজস্ব মতেই আবার ফিরে গেল। ওর এই প্রতিবাদের ভঙ্গিতে এমন একটা অটল প্রেমস্পর্শ ছিল যা আমাকে নিঃসন্দেহে অভিভূত করল। ওর হাতখানা তুলে নিয়ে বললাম, 'আমাদের উভয়ের কথাই ঠিক। তোমাকেও আমি ভালভাবেই জেনেছি তবু তোমাকে ভালবাসি বলেই তোমার সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে ও বলল, 'ঠিক তাই, নয় কি? কাউকে কেউ যখন ভালবাসে—তার সব কিছুকেই সে ভালবাসে, দোষ ত্রুটি সব।'

আমিও পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই ওকে বলতে চাইলাম, 'আমিও তোমার ঐ সুন্দর উজ্জ্বল চোখ, কুঞ্চিতকেশগুচ্ছ, মনোরম ফুলগুলি, এমনকি তোমার ঐ চমৎকার নৈশপোশাক পরিহিত বসার ভঙ্গিটুকুকেও ভালবাসি। এই একটু আগে তুমি যখন উন্মাদনায় এণ্টোনিওকে জড়িয়ে ধরে লালসার নৃত্য নেচে চলেছিলে, তখনও তোমাকে ভালবেসেছি, আর ভবিষ্যতেও তোমাকে আমি ভালবাসব।' কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোল না আমার। আমি বেশ বুঝলাম যে লীডা এখন অনুভব করতে পারছে, সব কিছুই আমি জেনে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটি তাই এখন বেশ থিতিয়ে এসেছে। আমি শুধু বললাম, হয়তো কোনো একদিন নতুন করে এ কাহিনী আমি লিখব, ঘটনার এখনো তো পরিসমাপ্তি ঘনিয়ে আসে নি,—কোনো একদিন, যেদিন বহু কিছু কথা প্রকাশ করবার মত ক্ষমতা আমি অর্জন করব সেইদিন বোধ হয় আবার নতুন করে কাজে হাত দেব।

আনন্দের সঙ্গে লীডা বলে উঠল, 'পরিপূর্ণভাবেই এ কথা আমি বিশ্বাস করি সিলভিও! তোমাকে এ কাহিনী নতুন করে লিখতে হবে, তবে কিছু দিন পরে।'

ওকে বিদায়-চুম্বন দিয়ে সোজা আমি আমার বিছানায় চলে এলাম। শিশুকে খেয়াল বশে বা তার কোন দুষ্টুমির জন্যে পিতা-মাতা শাসন করলে সে চেঁচিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। পরে তাকে একটু আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিলে সে নিশ্চিন্ত গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হয়, তেমনি এক সুগভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লাম আমি। পরের দিন ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। উঠে কামিয়ে নিয়ে একসঙ্গে প্রাতরাশ খেয়ে নেওয়ার পর একটু বাইরে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাব করলাম ওর কাছে। সেও রাজী হল সঙ্গে সঙ্গে।

খামারবাড়িগুলোর ওপারে একটা উঁচু ঢিবির ওপর পুরোনো কালের একটা গীর্জার ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে ছিল। পশুদের পায়ে চলার সরু পথ বেয়ে আমরা ওপরে উঠে এলাম। ওখানে গীর্জার আঙ্গিনাটি ঘিরে যে পাঁচিল ছিল তারই ওপর এসে বসলাম দু জনে। সামনের উদার প্রশস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের মুখোমুখি বসলাম আমরা। গাড়ি-বারান্দার তলায় যে থামগুলো দাঁড়িয়েছিল তার স্থাপত্য শিল্প থেকে বেশ বোঝা গেল যে গীর্জাটি বহু প্রাচীন। ঐ গাড়ি-বারান্দা আর খানিকটা দেওয়াল ছাড়া কিছুই দাঁড়ানো অবস্থায় ছিল না। পুবদিকের অর্ধবৃত্তাকার বিশ্রামের জায়গা ; অবশ্য মূল গীর্জা ভেঙেচুরে এমন ভাবে স্তূপাকার হয়ে গিয়েছিল যে তা থেকে কোনো কিছুই আঁচ করা যায় না। পুরোনো ধূসর বর্ণের পাথর দিয়ে বাঁধানো প্রাঙ্গণের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। দরজার ফাঁক হয়ে যাওয়া পাল্লার ভেতর দিয়ে গাড়ি-বারান্দার তলায় সবুজ পত্রবহুল ঝোপগুলো উঁকি দিচ্ছিল, আর সূর্যালোকে চকচক করছিল তাদের পাতাগুলো। গীর্জার দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল থামগুলোর একটার মাথায় একটা মুখোস খোদাই করা রয়েছে। এমনিতেই ওগুলো সাদামাঠা ধরনের তৈরী হত তার ওপর দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই ভাস্কর্যটিকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে গীর্জায় বিশ্বাসী মানুষদের মৃদু ভর্ৎসনা করার উদ্দেশ্যে যে সব দৈত্যের মূর্তি রাখা হত তাদের

থেকে এর পার্থক্য যে ধরা যাচ্ছিল না, তা নয়। হঠাৎ যেন মনে হল মূর্তির ঐ ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত বের করা হাসি আর মুখভঙ্গির সঙ্গে গতরাত্রে দেখা আমার স্ত্রীর মুখভঙ্গির কষ্ট-কল্পিত হলেও একটা সাদৃশ্য রয়েছে। অতীতের ভাস্কর নিশ্চয় মূর্তিটার পুরু ঠোঁটগুলোর ভেতর আর আসঙ্গলিপ্সু আচ্ছন্ন দৃষ্টির মধ্যে ঐ একই ধরনের লালসাকেই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল। থামের ওপরকার ঐ মুখটি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে লীডার দিকে চাইলাম আমি। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দৃষ্টি রেখে সেও তখন গভীর চিন্তামগ্ন। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে ও বলে উঠল, 'দেখ, কাল রাত্রে তোমার ঐ গল্পের কথা অনেক ভেবেছি আমি। আমার মনে হয় আমি বুঝতে পেরেছি কেন তোমার কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।'

'কেন?'

'তুমি তো ওর মধ্যে তোমার আর আমার চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই।'

'ভালকথা, তাহলে বলতে হয় শুরুতেই তোমার ভুল থেকে গেছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে, কাহিনীটি লেখার সময় আমার বা তোমার নিজের সম্বন্ধেও তোমার ধারণা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল না। আবার মনে হয় আমাদের কথা, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা নিয়ে কিছু বলার সময় এখনো আসে নি, বিশেষ করে আমাকে নিয়ে তো নয়ই। আমার স্বরূপটি তুমি মোটেই ফুটিয়ে তুলতে পারনি, আমাকে বড্ড বেশী আদর্শ মূর্তি করেই এঁকেছ তুমি।'

'আর-কিছু বলতে চাও?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'না আর কিছু না। আমার বিশ্বাস আমাদের পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হওয়ার পর তোমার এ কাহিনীটি আবার লেখা উচিত। কালরাত্রেও তুমি এই একই কথাই বলছিলে।

এখন যদি তুমি লেখ, একটা ভাল কিছু নিশ্চয় হয়ে দাঁড়াবে এ লেখাটা।'

এর কোনো উত্তরই দিলাম না আমি, শুধু বসে থেকে ওর হাতটা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। হঠাৎ ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ওই দানবের মুখটা একবার দেখে নিলাম। মনে মনে ভাবলাম, এরপর কাহিনীটি আরম্ভ করার আগে ঐ ভাস্কর দানবটা সম্বন্ধে যা চিন্তা করেছিল শুধু তাই জানলেই চলবে না, তার ঠিক বিপরীতটাও জানা দরকার হবে আমার। চিন্তার সমাপ্তিটুকু ঘোষণা করার জন্যই বোধ-হয়, খুব শান্তভাবে বলে উঠলাম, 'এ কাজটুকু করতে মনে হয় অনেকখানি সময় লাগবে আমার।'

আলবার্তো মোরাভিয়া

মোরাভিয়া এমন এক শ্রেণীর লেখক যিনি প্রেরণায় বিশ্বাসী। রচনার ক্ষেত্রে তিনি মনে করেন, কোন অদৃশ্য প্রেরণা তাঁর লেখনীকে নতুনতর কোন জগতের সন্ধান দেবে।

মোরাভিয়ার ভাষায়,—আমি আমার লেখার টেবিলে নিয়মিত বসি। প্রেরণা এলে লিখে যাই। কিছুদূব অগ্রসর হলে তারপর আমি নিজে ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করি। সব সময় প্রেরণার স্পর্শ পাই না কিন্তু তার আশায় আমার বসার বিরাম নেই।

ছোট আকারের উপন্যাস রচনাতেই মোরাভিয়ার আগ্রহ সব-চেয়ে বেশী। তিনি মনে করেন, চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত না করে স্বল্প পরিসরের মধ্যে সংহত করতে পারাই রচনার সার্থকতা।

এই সব বিচিত্র ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারার অধিকারী মানুষটি বর্তমান ইতালীর পুরোধা সাহিত্যিক রূপে চিহ্নিত।

জন্ম তাঁর ১৯০৭ সালে রোম নগরীতে। ন'বছর বয়স থেকে বিশ বছর পর্যন্ত সংগ্রাম করেছেন তিনি রোগের সঙ্গে। এরই মধ্যে তাঁর সৃষ্টির দ্বার খুলে যায়। ১৯২৫ সালে মোরাভিয়ার প্রথম উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে।

এরপর ঘটনাবহুল কর্মজীবনে নানাপথ পরিভ্রমণ করে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

জীবন-সন্ধানী ও দরদী সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর গ্রন্থগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হলে লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়ে যায়।

লেখক মোরাভিয়া আজ আর কেবলমাত্র ইতালীর সম্পদ নন, সমগ্র বিশ্বের পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে লেখার মাধ্যমে তিনি একান্ত প্রিয় হয়ে পড়েছেন।

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মাইতি একটি সুখশ্রুত নাম। কাব্য, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ—সাহিত্যের প্রায় সর্বশাখায় শ্রীযুক্ত মাইতির সমান বিচরণ। মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছেন।

'দাম্পত্যপ্রেম' তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। মূলকে অক্ষুন্ন রেখে ভাষান্তরিত করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ শিল্পকর্ম। শ্রীযুক্ত মাইতি এই অনুবাদটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখেননি।

১৯২৭ খৃঃ শ্রীযুক্ত মাইতি মেদিনীপুর জেলার এক বিশিষ্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে সাহিত্য-সাধনা ছাড়াও তিনি অধ্যাপনার কার্যে বৃত্ত আছেন।

অন্যান্য অনুবাদ-গ্রন্থ

উপন্যাস

কাদম্বরী—বাণভট্ট। অনু.: প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	১২.০০
ডাক্তার জিভাগো—বরিস পাস্টেরনাক। অনু: দীপক চৌধুরী	১২.৫০
অপমানিত ও লাঞ্ছিত—ডস্টয়েভস্কি অনু: সমরেশ খাসনবিশ সম্পাদনা: গোপাল হালদার	৮.০০
অমৃত-আলোতে—হেরমান হেস অনু: শিউলি মজুমদার	৬.০০
অস্তগামী সূর্য—ওসামু দাজাই। অনু: কল্পনা রায়	৪.৫০
অচেনা—আলব্যার কামু। অনু: প্রেমেন্দ্র মিত্র	৪.০০
পতন—আলব্যার কামু। অনু: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৪.০০
শেষ গ্রীষ্ম—বরিস পাস্টেরনাক। অনু: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩.০০
উন্মত্ত—স্তেফান জোয়াইগ। অনু: দীপক চৌধুরী	৩.০০
ত্রয়ী—স্তেফান জোয়াইগ। অনু: দীপক চৌধুরী	৩.০০
উত্তরণ—স্তেফান জোয়াইগ। অনু: দীপক চৌধুরী	৩.০০
মোনা লিসা—আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া। অনু: বাণী রায়	২.৫০

বিবিধ

জীবন-জিজ্ঞাসা—আইনস্টাইন ... সংকলন ও অনু: শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা: সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জাতীয় অধ্যাপক	৮.০০
ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ—সংকলন ও অনু: পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫.০০
সুখের সন্ধানে—বারট্রাণ্ড রাসেল। অনু: পরিমল গোস্বামী	৫.০০
ছায়াময় অতীত—মহাদেবী বর্মা। অনু: মলিনা রায়	৫.০০
ডাকের কথা—লরিন জিলিয়াকাস্ অনু: পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪.০০
একটি ধানের শীষের উপরে [জাপানী কবিতা সংগ্রহ] সংকলন ও অনু: জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়	২.৫০

গল্প-সংগ্রহ

চীনামাটি [ছোট গল্প সংকলন] ৬'০০

অনু : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

: অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প সংগ্রহ—১ম খণ্ড ৫'০০

অনু : দীপক চৌধুরী

স্তেফান জ্বোয়াইগের গল্প সংগ্রহ—২য় খণ্ড ৫'০০

অনু : দীপক চৌধুরী

শহরতলির শয়তান—বারট্রাণ্ড রাসেল। অনু অজিতকৃষ্ণ বসু ৪'৫০

নীল চন্দ্রমল্লিকা—কারেল চাপেক ৪'০০

অনু : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

: মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়